বি-কেলাস

অতীন্দ্রনাথ বসু

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*

মুদ্রাকর
শ্রীরসিকলাল পান
গোবর্দ্ধন প্রেস
২০৯ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*

প্রাপ্তিস্থান
ক্যালকাটা বুক এজেন্সী
৭ কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*

বন্ধনশিল্পী
বিবেকানন্দ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
২৩ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*

প্রচ্ছদপটশিল্পী
শ্রীঅনিল বসু
কলিকাতা

বৈশাখ, ১৩৫৫

*

দাম তিন টাকা

লেখাটী আনুপুর্বিক জয়শ্রীতে, এর দুটী অংশ গল্পাকারে ছদ্মনামে রবিবারের অমৃত-বাজারে এবং শেষ অংশ প্রবন্ধাকারে সমীক্ষণে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও গ্রন্থকার তারপর অনেক স্থানে পরিবর্ত্তন করেছেন তবুও পূর্ব-প্রকাশিত রচনা পুনঃপ্রকাশের সময়ে ঐ সমস্ত কাগজের কর্তৃপক্ষকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আর গ্রন্থকারের অন্তরংগ দু-একজন সাহিত্যিক বন্ধু যাঁদের সংগে তাঁর সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নয়, তাঁদের কাছে আমরা সশ্রদ্ধ ঋণস্বীকার না ক'রে পারছি না।

—প্রকাশক

এই লেখকের লেখা

বিজ্ঞান ও দর্শন

পশ্চিমবংগ নিরাপত্তা বিল

জাতীয় সংগঠন পরিকল্পনা

Social & Rural Economy of Northern India

Crossroads of Science & Philosophy

A Plan for National Reconstruction

সমুদ্রের বাঁধ

আমি এক চোখে দেখি বস্তু, এক চোখে দেখি স্বপ্ন। এই 'দর্শন' দিয়ে দেখছি বাঁধঘেরা সমুদ্রকে—তার তরংগগুলির অশান্ত আছাড়ি পিছাড়ি আর ক্ষীয়মান জীবন-হিল্লোল। বন্দী সাগরদোলাকে ভাষায় রূপ দিতে চাই। উপন্যাস লিখতে গেলে স্বপ্নের বুনুনী ছিঁড়ে যায়। বিবরণ দিতে গেলে ঘটনার বাঁধুনি থাকে না। কাজেই আমি বলছি কথা—উপকথা নয়, ইতিকথা নয়, শুধু কথা।

আমি অকেজো লোক। সবাই জানে জাপানকে মদদ্ দেবার মুরোদ আমার নেই। আত্মীয়-স্বজন বলেন ওকে ধরল কেন? বেহুঁসে জড়িয়ে পড়েছে হয়ত'। বন্ধুরা পর্যন্ত আমাকে বলে কবি। মানে পদ্যলেখক নয়, অকর্মা। কাজের কথায় কখনো আমার ডাক পড়ে না। দৈবাৎ কদাচিৎ কোন কথার মধ্যে পড়ে গেলে তারা বলতো—যাও যাও, রেখে দাও তোমার কাব্য আর থিওরি।

তবু ধরা পড়লাম। শুধু এবার নয়, বার বছর আগে সেই তিরিশ সালেও। তখন ছিলাম সন্ত্রাসবাদী। দরদী দেশনেতা বলতেন সন্ত্রাসবাদ বিকৃত আদর্শপ্রবণতা। প্রফেসার আর উকিল নামকামী হলে ছাত্র-ও যুবসভায় বলতেন সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে রাজনৈতিক

হতাশা মনোবৃত্তি। আজকের জাপানরোখা সোভিয়েটত্রাতা জনযোদ্ধারা বলতেন সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে উচ্ছন্ন-যাত্রী পাতি-বুর্জোয়ার হতাশপন্থা,—এরাই এখন নতুন আশার আলো পেয়ে ফ্যাসিবাদী হয়েছে। ভারতবন্ধু ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বলেছিলেন বাদ-ফাদ নয়, এ স্রেফ্ ক্রাইমবৃত্তি। একজন শ্বেতাংগের জীবনের বদলে দশটাকে জেল থেকে বার করে গুলি কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

একজন আইনসভার সদস্য বলেছিলেন—অজ-পাড়াগেঁয়ে ঘোমটা-ওলা মেয়ের সংগে বিয়ে আর তিরিশ টাকার চাক্‌রি দিয়ে দাও, সেরে যাবে রাজনৈতিক হতাশা।

সত্যিই এই ওষুধে অনেকের সেরেছে।

বন্ধুরা ক্ষেপে উঠ্‌তো। কে বলে টেররিষ্ট, আমরা রেভল্যুশনারি, বিপ্লবী। সুরু হোত বিপ্লবের দর্শন লেখা—ফিলসফি, প্রোগ্রাম, ষ্ট্রাটেজি, থিসিস্।

তখন বক্‌সায়। কাজের আসরে আমার ডাক পড়বে না জানি, নিশ্চিন্ত হয়ে বসতাম দক্ষিণের ঢালুটার নির্জন কোনে। হিমালয়ের বুকে ব'সে দেখতাম মেঘে-কুয়াসায় ঢাকা ধূসর বাংলাদেশ। আকাশে রংএর ফুলঝুরি, পিছনে শ্যাম বনানী ধাপে ধাপে উঠে গেছে, দূরে পাগলাঝোরার অশান্ত মর্মর, আগুনের কণ্ঠী প'রে ধোঁয়ার এলোচুল উড়িয়ে পাহাড় ব'সে আছে রাতের প্রতীক্ষায়। নীচে দূর দিগন্ত-বিস্তৃত সমভূমি ক্রমে রং বদলাচ্ছে—নীল, ছেয়ে, হঠাৎ সোনালী, শেষে কালো।

ঐ হাতির দাঁতের মিনারে ব'সে আমার বুকের পদ্মফুল মধুতে ভরে উঠতো, আকাশের পানে পাঁপড়ি মেলে দিতো, নিখিলের রূপলক্ষ্মী তার ওপর অতি মৃদু পা রাখতেন। ধূসর আবছায়া বাংলার অধিত্যকা দেখে মনে হোত সমুদ্র। কত সুখের নীড়, কত

হাট ওখানে, কত উচ্ছ্বসিত হাসিকান্নার ঢেউ, কত রংএর বাহার! মায়াময়ী বকুলায় বসে দেখেছি আমার রূপলক্ষ্মীর পায়ে সমাহিত সমুদ্রের প্রগাঢ় প্রণতি।

হঠাৎ একদিন গজদন্তমিনার থেকে সমুদ্রের মাঝে এসে পড়লাম। যাদুকরের কার্পেট উড়িয়ে নিয়ে এল নন্দনগিরি থেকে ক্রন্দনগুহায়। অবতীর্ণ হলাম বাংলার এক ঊষর প্রান্তরে।

ভদ্দরলোক নেই—এখানকার কাঁকর-পাথর চ'ষে ফসল তুলতে পারে শুধু অনার্য বাউরি ও সাঁওতাল। ফসলের সময়ে এরা দুবেলা ভাত খায় আর প্রচুর মদ। মাস দুই যেতে না যেতে একবেলা ভাত, একবেলা মাড়, আর ক'মাস বাদে ভুট্টা, কচু, হিঞ্চেশাক কিম্বা কিছুই নয়। সাঁওতালদের মধ্যে যারা বেপরোয়া তারা মেয়ে-মরদ আড়কাঠির কাগজে টিপ দিয়ে কয়লাখাদে চলে যায়, বুড়ি মেইঝান চোখ মোছে।

জোতদারের জমি অর্ধেক ভাগে চাষ ক'রে যা মেলে তা চালের ব্যাপারীর কাছে সস্তায় ছেড়ে দেয়। মহাজনের সুদ আর সরকারি কৃষিগণ শোধ দিয়ে বাকিবকেয়া যা কিছু শুঁড়ির দোকানে উড়িয়ে ফতুর হয়ে আসে। জোয়াল গরুর বালাই অনেকেরই নেই। খাসি পাঠা, হাঁস মুরগী দু-চারটে যা আছে তার অর্ছি থানার দারোগা,—হাকিম, ডিপ্‌টি, সার্কেলবাবু অনেক দেবতার ভোগের জন্যে তাদের উৎসর্গ করে রাখতে হয়। আকাশের দেবতা আশীর্বাদ পাঠান—ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ।

ব্যাধি ও ক্ষুধার সাথে স্বচ্ছন্দে বাঁধা এদের ঘরকন্না। বিয়েতে পরবে নাচগান আছে, বাজি রেখে মোরগের লড়াই আছে, পচাই মদের দোকানে দিলখোলা হল্লা আছে—মরণ ও দারিদ্র্যের ভয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়।

এই সমুদ্রে স্নান ক'রে আমার যক্ষকায়া ঘুচল, আমি নরদেহ পেলাম। ধুয়ে গেল চোখের মায়াকাজল, শুকিয়ে গেল নীলাপদ্ম, বিদায় নিলেন রূপলক্ষ্মী। হিমালয়ে নয়, মেঘলোকে নয়, লক্ষ্মী লুকোলেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অতলে। হারিয়ে ফেল্লাম আমাকে। তরংগ আমার সাথী হল।

সেই থেকে আমি সামুদ্রিক জীব। ঢেউ-এ ভাসা তল্তলে জেলিমাছ, মেরুদণ্ডহীন। লক্ষ্মী আমার নাগালের বাইরে। হাল ধরতে জানিনা, কম্পাসও চিনি না। কিন্তু সমুদ্রের নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। তিন বছর পরে সাঁওতাল বাউরি মিতাদের কাছে বিদায় নিলাম। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সড়ক দিয়ে বাসটা আমাকে পাটশুদ্ধ তুলে নিয়ে গেল। আমার ছোট্টো খড়ছাওয়া কুটিরটার আঙিনায় শুকু, বিশু, বাঙি, ঘণ্টু আর একপাল ছেলেমেয়ে চেয়ে রয়েছে অনিমেষ। গেল পলাশের বন, শুড়িখানা ঝংকা'র তড়া। বড় টিলায় বাস বাঁক ঘুরল, আর দেখা যায় না। গাঁয়ের ভেতর থেকে মেঠোসুরে ভেসে এল—

পিরীত করলে হয় বিপরীত ঘটে যন্ত্রনা
ঠিক থেকো মন পিরীত কইরো না।

মন ঠিক থাকেনি, তাই পিরীত, বিপরীত এবং আজকের এ যন্ত্রণা।

১৯৪২ এর মাঝামাঝি। ঝড়টা প্রথমে আসছিল পূব দিক থেকে। মায়ু-কালাদানের তীর পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে গেল পলক না পড়তে। আরাকান গারো-চীন পর্বতের আড়ালে ঘাটি বাঁধতে লাগল ইংরেজ

সেনা, ঝড়টা ঐ দেয়াল পর্যন্ত এসে শান্ত হতে লাগল। শুনলাম শুধু ঝড়ের আওয়াজ। ট্রেনে জাহাজে পালাবার জায়গা নেই, সহরের রাস্তায় মিলিটারী গাড়ীর মহড়ায় লোক চাপা প'ড়ে মরছে,—ঝড়ের সাথে আমাদের সাক্ষাত পরিচয় এইটুকু।

তারপর আরএকটা ঝড় উঠল পশ্চিম দিক থেকে আগষ্ট মাসে। এ ঝড়ে বাজ পড়ল, আগুন জ্বলল, ঘর পুড়ল, লোক মরল অনেক। এ ঝড়ও আরাকান-গারো-চীনের দেয়াল পেরিয়ে পূব দিকে গেল না। দুটো ঝড়ে আলিংগন হোল না।

অনেক দিন আগে বাঙলা দেশে কতক ভদ্দরলোক খুনেডাকাত ছিল। যাঁরা সত্যিকারের ভদ্দরলোক তাঁরা এদের বলতেন, এনার্কিষ্ট টেররিষ্ট। লোকে কি বলতো সে কথায় কাজ নেই—সে ছোটলোকদের কথা জানতে চাও ত' পাড়াগেঁয়ে বাউলের মুখে ক্ষুদিরামের গান আছে, পানের দোকানে ভগৎসিং যতীনদাসের ছবি আছে আর কুমিল্লা জেলে বি-কেলাস কয়েদীদের মুখে শুনতে পাবে শান্তি-সুনীতির গান কিম্বা এখানে মাম্নুর "শহীদোঁকি টোলি নিক্‌লি"। আমরা বলছি ভদ্দরলোকদের কথা,—যা কাগজে ছাঁপা হয়, কন্‌ফারেন্সে পাশ হয়, নেতাদের ভাষণে বা বিবৃতিতে বেরোয়, সাহিত্যিকরা যা নিয়ে নভেল লেখেন।

যে জন্যেই হোক, ঐ মেকি ভদ্দরলোকগুলোর খুনখারাবি বন্ধ ছিল। অনেকের চরিত্র শুধরেও গেল সত্যি। কিন্তু কে জানে, যে দুর্দিন আসছে আবার এদের কি মতিগতি হবে? বদলোকেরা উতলা জলে মাছ ধরবেই। হঠাৎ ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি নিরুদ্দেশ হলেন। সেই শুভদিনে সন্ত্রাসবাদীদের নতুন নামকরণ হোল পঞ্চম বাহিনী, অর্থাৎ গৃহশত্রু কিম্বা শত্রুচর। আর কালোখাতায় প্রথম নাম উঠল নিরুদ্দিষ্ট রাষ্ট্রপতির।

খাঁটি ও মেকি ভদ্রতার মাঝখানে ঝুলল কিছুদিন জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু ঝড়ঝাপ্টার দিনে বেড়ার ওপর ব'সে থাকা যায়না। শেষে নামল কংগ্রেস মেকির কাজে, ফাসিবিরোধের রামনাম নিয়ে, গণতন্ত্রের গংগাজল খেয়ে। কি হয় তাতে? সব ঝড়ে ওলট-পালট হয়ে যায়। অহিংসবাদী ও সন্ত্রাসবাদীর লেবেল মারা কঠিন ছিলনা—সাম্রাজ্যবিরোধী গণতন্ত্রী আর পঞ্চমবাহিনীর ভেদরেখা খুঁজে বের করা লর্ড সিংহ রোডেরও অসাধ্য! সব এক বেড়াজালের টানে উঠে এসেছে শ্রীঘরে।

তা বলে স্বদেশীর ঝাণ্ডা তুলে রাখবার জন্যে দেশে কি খাঁটি ভদ্দরলোক আর রইল না? পূবের ঝড় যখন ঠান্ডা হয়ে এসেছে, ইংরেজ-মার্কিন-আনজাক-কাফ্রি সেনা পূর্ববংগ ও আসাম ছেয়ে ছাউনি গেড়েছে, চাষীর জমি জেলের নৌকা কেরাণীর সাইকেল দেশরক্ষার কাজে বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সেই সময়ে শত্রু ও গৃহশত্রুদের রুখবার জন্যে খাঁটি স্বদেশী ভদ্দরলোকেরা পায়তাড়া কষছিলেন। ব্রহ্মদেশে অবস্থিত জাপানীর বর্বরতায়, কারারুদ্ধ ফাসিবাদীদের দেশদ্রোহিতায় দেশের লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরল। তীব্র গণআন্দোলন, না জনযুদ্ধ চলল ফ্যাসিবাদ ও পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে। কিষাণ সভা, মজদুর সংঘ, ছাত্রসম্মেলন, আইন পরিষদ, খবরের কাগজ, গণতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধার্থী ব্রিটিশরাজ কিছুই বন্ধ করেনি। সর্ব্বত্রই পাবে এই স্বদেশী ভদ্দরলোক জনগণের কথা,—সভার প্রস্তাবে, আইন পরিষদের বক্তৃতায়, পেশাদারী খবরের কাগজে আর সংস্কৃতি-সংকট-ত্রাতা প্রগতিশীল সাহিত্যে।

মুখবুজে মরল যারা, তারা ছোটলোকের দল—পঞ্চমবাহিনী নয়, কিষাণ সভার কিষাণ নয়, বিপ্লবের ভেংগার্ড সর্বহারা মজদুর নয়,—তারা কেউ নয় শুধু ছোটলোক। তারা চিরকাল মরে হাজারের

হারে, এবার ক্রমে অযুতে, শেষে লক্ষে লক্ষে। মুখ বুজে মরেছে, মুখ তুলে নালিশ করেনি, বোধ হয় অভিশাপও দেয়নি কাকেও, শুধু বলেছে অদৃষ্ট, কর্মফল কিম্বা নছিব, আল্লার ইচ্ছা।

আইন সভায় ও খবরের কাগজে জাপানরোখা বক্তৃতার আড়ালে কালোবাজার ও অতলগুহা কোথায় লুকিয়ে ছিল তা সবাই জানে— কিন্তু কেউ জেনেও জানেনা। যারা এদের উচ্ছিষ্ট উদ্বৃত্ত কিছু জুটিয়ে নিয়ে বাঁচতে পেরেছে সেই পাতি-বুর্জোয়ারাও জানেনা চোরাআড়ত কোথায়। জনযোদ্ধারা বল্লেন মুনাফাদারদের ধ'রে চরম সাজা দাও—তারাও পঞ্চম বাহিনী। খদ্দরের নামাবলি পরা স্বদেশী মার্কামারা মুনফাদার চোখটিপে বল্লেন—আমি ত' তোমার ফাসিবিরোধী ফ্রণ্টের মেম্বার। আর দেখালেন দুহাতে দুটি কাগজ—একটিতে বখরার আশ্বাস আর একটি ভারত-রক্ষা আইন।

কালোবাজার খুঁজতে গিয়ে লালবাজারে হাজির হয়ে লাভ নেই। কাজেই গেল সাইক্লোন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক। রইল জাপানরোখা, সোভিয়েটরক্ষা। দুর্ভিক্ষের জন্যে মানুষ দায়ী, কেন না মানুষ ভিক্ষে দেয় না। মন্বন্তরে মানুষ কি করবে? মনু বদ্‌লাচ্ছে, মানুষ কোন ছার।

ছোটলোকেরও অধর্ম কতকগুলি লোক বাঁচতে চেয়েছিল। চাষবাড়ী, গরুর গাড়ী, নৌকাজাল যখন জাপানকে রুখবার কাজে সরকারে জমা হোল, তখন তারা আল্লার নাম নিয়ে জিকির দিয়ে হাট লুঠ করেছে, মহাজনের নৌকায় ডাকাতি করেছে কিম্বা জোতদারের গোলা ফাঁক করেছে। এই বিশ্রী লোকগুলো এসে শ্রীঘর আলো করেছে। তাদের সাথে আছি আমি,—আমি পঞ্চম বাহিনীর লোক।

সেণ্ট্রাল জেল,—বক্‌সার মায়াকুঞ্জ নয়। বিপ্লবের থিসিস আর ললিতকলা নিয়ে আত্মসর্বস্ব ভাবুকগোষ্ঠি এখানে নেই। দেয়ালের পর দেয়াল জায়গাটুকুকে ফেঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে রেখেছে। ছাতার মত ছোট্টো আকাশটুকু। আমাদের স্বজাতি মাত্র জন পঞ্চাশ। বাকি হাজার বারশ'র মধ্যে আছে নানা জাতির লোক—গুণ্ডা সিক্যুরিটি, জাপানী গুপ্তচর, রকমারি গোত্রের কয়েদী—লালটুপি, কালোটুপি, হলদেটুপি, এ-কেলাস, বি-কেলাস,—মানে কাঁচা আর পাকা ; চোর, জুয়াচোর, মেয়েচোর, পকেটমার, গুণ্ডা, ডাকাত, খুনে। আলাদা আলাদা সব দল বা গ্যাং। বাদসাহি জেল।

বন্ধুরা বলে কবি এবার খুব জব্দ হয়েছে। খোলার মধ্যে সেটে বসেছে যেন শামুকটি। আমার সেলটা শামুকের খোলার মতই ; কিন্তু সে বাহ্যত। আমি দেখি এটা নাটাই, আমাকে সুতোর মতো গুটিয়ে রেখেছে। যখন খুসি মনটাকে ঘুড়ির মতো ছেড়ে দেয়,—পাঁচিল পেরিয়ে শালবনে, বালুচরে, পদ্মায়, মেঘল আকাশে উড়িয়ে আবার এই ডেরায় নামিয়ে এনে রাখে।

আমি সেলে থাকি। সিক্যুরিটি ইয়ার্ডে আছে হৈচৈ, তর্ক, গানবাজনা, পড়াশুনা, ক্লাস, থিসিস্। ও যৌথজীবন ভাল লাগেনা। বন্ধুরা বলে আমি ভাবুক স্বপ্নবিলাসী, এস্‌কেপিষ্ট—জেলখানার রূঢ় আবেষ্টন থেকে পালাবার পথ খুঁজি চায়ের পেয়ালায় আর তারার দেয়ালিতে। মনে মনে হাসি। পালাই বটে, তবে জেলখানা থেকে নয়, তোমাদের সরাইখানা থেকে। বেনো জল থেকে পালিয়ে এসেছি

লোণা জলে, যেখানে বাঁধদেওয়া সমত্রতরংগ তুলে আনে উর্বশীর ফেনিল প্রসাদ. ঠিকানা পায়না কোথায় আছে লক্ষ্মীর আঁচলঢাকা সোনার ঝাঁপি।

নাই বা পেল। নেশা তো আছে, ইউলিসিস-এর নেশা, যাত্নকরী সার্সি, নরভুক সাইক্লপ্‌স্‌, সাইরেনের ঘুমপাড়ানী গান—

নানা দেশের নানা জাতি মিল্যাছি এক ঠাঁই
পাঞ্জাবী বাঙালী বলে দেশোয়ালী ভাই
মোদের মতন পরম সুখে কে আছে ভাই মণ্ডলে
জেলখানাতে দুঃখে আছেন কেয় বলে ?

পাশের সেলএ মকবুল থালা বাজিয়ে গান ধরেছে। দিনের বেলা বাগানে খাটে, সন্ধ্যার আগে খোপে ঢোকে। যক্ষারোগীর মত জিরজিরে দেহ আর ঝক্‌ঝকে ক্ষুধার্ত্ত চোখ। লম্বা একটা সেলাম দিয়ে নিজের বীরত্বকাহিনী বলে—বন্দুক আর মেয়ে তার মধ্যে থাকেই। গলা ছোট ক'রে অর্থপূর্ণ ভংগিতে বলে 'বাবু'—। একটা বিড়ি আদায় ক'রে লান্‌স্‌লট তালাবন্ধ • হয়। বিড়ি ধরিয়ে টান দেয় আর কাসে। সিকের ফাঁক দিয়ে অন্ধকারে দেখা যায় শুধু এক ফোঁটা টক্‌টকে আগুন। যেন যক্ষ্মার প্রেতটা ওর চোখ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

অন্ধকারে শুইয়ে থাকি নানা বিপদ হয়
চারিদিকে চেইয়ে দেখি লাগে বোঁতের ভয়
তাই তোমাদের মাথার উপর হারিকেন বাত্তি জলজলে
ভাইরে, জেলখানাতে দুঃখে আছেন কেয় বলে ?

ঠিক। কে বলে দুঃখে আছেন! তুমি যে লান্‌স্‌লট, থালা বাজিয়ে উড়িয়ে দাও মৃত্যুকে। একটা বিড়ির বেশী উচ্চাশা নেই। খুস্‌খুসে কাসি আর ঘুস্‌ঘুসে জর এদের কি দুঃখু বলে ? তবে হ্যাঁ—

সিপাইবাবু পোড়ার পুত না বুঝে আমার দুখ
তার হুকুমে রোধ করিলে মারবে রুলের বাড়ি।
হারে দিওনা জেল বেড়ি
অপর দোষে ক্ষমা কর হয় এস্তাজারি।
ডাক্তারবাবু পরম পাজিরে
আরে করে কাম জারি
জ্বর হইলে রোগ চিনেনা গিলায় কুইনাইন বড়ি
হারে·······এস্তাজারি।
জেলারবাবু পরম পাজিরে
দিবে গম ঘানি
একছটাক তেল কম হইলে লাগায় ডাণ্ডাবেড়ি
হারে · ····এস্তাজারি।

তারায় ভ'রে গেছে আকাশ। কালপুরুষ, সপ্তর্ষী, অগস্ত্য। কেউ দু-চার আলোবছর দূরে কেউ বা লক্ষ লক্ষ। কত ছায়াপথ নিখিলের অংগনে আলো লেপে দিয়েছে, কত নীহারিকা দীপালি সাজিয়ে বৃত্তপথে নেচে বেড়াচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাদের আলো পাড়ি দিচ্ছে আকাশপারাবার। কী দেখছে এন্ড্রোমিডা? সিপাই রুলের বাড়ি মারছে মকবুলকে? না। দেখছে গুহামানব পাথরের ডাণ্ডা নিয়ে বন্যপশুকে ধাওয়া করেছে।

মকবুল! মকবুল! আরে বিড়ি!

মকবুলের কাসি ও গান দুইই থেমেছে। আ-উ ক'রে পাশ ফিরল। ও এখন মেঘনার চরে হাসিনার বুকে।

পঞ্চম বাহিনী

"শেরকা বাচ্‌চা ভগৎসিং নে
রাজগুরু সুখদেব,
হাসতে হাসতে চড়ল ফাঁসি
লাহোর সেণ্ট্রাল জেল।
শহীদোঁকি টোলি নিক্‌লি রে—"

ভোর সাতটার পর নম্বরের তালা খুলতে সার বাঁধা কয়েদীর ফাইল পেরিয়ে গুণ গুণ ক'রে গাইতে গাইতে যে লোকটি দক্ষিণের দেয়ালের দিকে যাচ্ছিল তার নাম মান্নু। হাঁ, ভোর সাতটাই বটে। প্রথম কথা—শীত পড়েছে, অঘ্রাণের মাঝামাঝি। তার চেয়ে বড় কথা—নম্বরের তালা যখন খোলে তখনই আইনত ভোর।

মান্নুও কয়েদী। ডোরা কাটা জাঙিয়া কুর্তা, মাথায় কয়েদী-টুপি লাল রং এ রং-আনো—ছুর্বৃত্তির আভিজাত্য সে যে এখানে এসেও খোয়ায় নি তার সাক্ষী। পা'য় এক জোড়া স্যাণ্ডেল, যা সংগ্রহ ও নির্বিবাদে ব্যবহার করা থেকে বোঝা যায় তার মালিক 'কামিল আদ্‌মি'। কান-ঠোঁট পর্যন্ত চাদর মুড়ে ফাইলের পাশ কাটিয়ে মান্নু যাচ্ছিল দক্ষিণ দিকে ঢেঁকিচালির কাছে।

কালো ছোট্টটো মানুষটা। তাগ্‌ড়া জোয়ান নয় বরং একটু

রোগাটে। হাড়ে-মাসে-লম্বায় যেটুকু না হলে নয় তাই। মেদমাংস এমন কি গায়ের জোরও যেন বেশী থাকা একটা জন্‌জাল। চোখদুটী ও চলা এই দিয়েই ওকে চেনা যায়। এরাই বলে দেয়—গায়ের জোর বেশী কী দরকার ?

সেণ্ট্রাল জেল। দক্ষিণ সীমানার প্রাচীরের ধারে ছোট একটু মাঠ। তার পূব দিকে হাসপাতাল, আর মাঝখানে ঢেকিচালি। ভেতরে সারবন্দী ঢেকি,- স্বর্গে এসেও ধান ভানছে। অথচ ভাবখানা যেন রবট কিম্বা ভি-টু। চারদিকের ঘের খানিকটা পর্যন্ত ইট-ঘের-করা দেয়াল, তারপর তারের জাল,—ফাঁকগুলো মাকড়সার জালে ও ঝুলে ভর্তি। যাঁর পরিকল্পনা তিনি হয়তো জানলার জালে আইভিলতার বিলিতি কায়দা নকল করতে চেয়েছিলেন। 'কিম্বা হয়ত' মাঠটা খালি দেখে ভেবেছিলেন—এঃ! জায়গাটা যে দেখতে বড্‌ডো ভালো হয়ে গেল!

যাক্ গে। মান্নুর তাতে আসে যায় না। মাঠের উত্তর দিকে ছোট দেয়াল ঘেঁসে ও তিন বর্গ হাত জায়গায় মাটি তৈরী ক'রে কি যেন লাগিয়েছে। ছোট ছোট অংকুর উঠেছে। ভোর হতে ও প্রথম এসে এইখানে দাঁড়ায়, নীচু হয়ে প্রত্যেকটী চারা গুণে গুণে ভাল ক'রে দেখে। মাঝে মাঝে যেন একটু চটেও যায়—কোনটার ডগা ভেঙেছে কিম্বা রং ফ্যাকাসে দেখলে।

তাজ্জব লাগে। মান্নু চাষী নয় মালীও নয়। অতটুকু জায়গায় চাষ বা বাগান হয়ও না। কিম্বা ও পুষার বটানিস্টও নয় যে তিন হাত জায়গায় কৃষিতত্ত্বের কোন সূক্ষ্ম গবেষণা চালাবে। জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলে "সখ বাবু।" দ্বিতীয় প্রশ্নের রাস্তা বন্ধ করে দেয় এই ব'লে—"অনেক দিন গোল্ড্ ফ্লেক টানিনা বাবু, যদি—"

দক্ষিণ দেয়ালের ওপারে একটু দূরে শুকনো পদ্মা। অল্প জল কিন্তু

খুব চওড়া। এপারে প্রশস্ত বালুচর, তারপর গুটিকয়েক শালগাছ। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বালুর পাক উড়িয়ে দেয়ালের গায় ঝাপ্‌টা মারে। সে খবর এদিকে আসে না—শুধু শোঁ শোঁ কিম্বা ঝির ঝির আওয়াজ শুনে বোঝা যায় যে ওপারে গাছ নদী বালু বাতাস সংগত বসিয়েছে। ওপারে বাঁধ-ভাঙা বাতাস ঢেউ তুলে ছুটেছে—এপারে ঢেকিচালির মাঠ একটা বাতাসের চৌবাচ্চা। কয়েকটি ডাঙার কইমাছ ভোরবেলা এখানে এসে ফর্‌ ফর্‌ ক'রে সাঁতার কেটে যায়।

দেয়াল টপ্‌কে বাতাস আসে। জলকনা ও বালুকনা প'ড়ে যায় নীচে। ওপরের পাৎলা হালকা হাওয়া শালফুলের ঝাঁঝালো মদির গন্ধ উড়িয়ে এনে নাকে কানে ছেড়ে দেয়—সারা গায় পাক দিয়ে ওঠে।

আমি ডাঙার কই। এখানে সাঁতার কাটতে আসি। মান্নু ওরা সাঁতার কাটতে আসে না, আসে 'কাজে'।

তিন হাত বাগানের পাশ থেকে মান্নু ডাকল—"ভিখন!" এত নীচু আওয়াজ অথচ এত দূর থেকে স্পষ্ট শোনা গেল। একটা তীর যেন শোঁ করে ছুটে গেল।

ভিখনলালের চেহারা দেখে মনে হোল বুঝি ডাকটা সত্যিই তীরের মতো তার গায় বিঁধেছে। বল্‌ল—"সর্দার—"

লম্বায় চওড়ায় ওজনে ভিখন মান্নুর চারগুণ। আর দু-তিনটে যারা তার সাথে এল তারা এ দুজনের মাঝামাঝি। তিন হাত বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা বাদানুবাদ হোল। বাগানের কথা নয়, সুখদুঃখের কথা নয়, ধমক তর্ক শল্‌লা এমনি মনে হয় দূর থেকে। বেশীক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচ।

তারপর পুব দিকের দেয়ালে চলে এল মান্নু। হাসপাতালের দোতালায় সুনীল দাঁড়িয়ে। সামান্য দু-একটি ইসারায় কি একটু কথা হোল।

কী? ঐ কজন ছাড়া আর কেউ জানেনা—কোনদিন জানবেও না।

মান্নু যেন একটু উত্তেজিত হয়েছিল। ঠাণ্ডা হয়ে গুণ গুণ ক'রে গান ধরল—বোধ হয় তার সেই পেটেণ্ট—"শহীদোঁকি টোলি নিকলি—"

মানে—শহীদদের দল ধরা পড়েছে।

হাঁ, যা বলছিলাম। মান্নু, ভিখন, ইউসুফ, স্থনীল এদের মধ্যে পাঁচ মিনিট কী শলা-পরামর্শ হোল তা কেউ জানবে না। এই রকম অনেক খুঁটিনাটি খবর আছে যা পাকা হাতে পড়লে ভাল উপন্যাস তৈরি হোত, ভাল খাঁটি উপন্যাস, প্যানপেনে সিনেমার রোমান্স কিম্বা 'প্রগতিশীল' বস্তি-সাহিত্য নয়। এখানে যারা এসেছে তারা নির্জীব মুমূর্ষু অদৃষ্টবাদী বাঙালী নয়। চোর, বাটপাড়, লম্পট, খুনে সবাইকে আসতে হয় জীবনীশক্তির ছাড়পত্র নিয়ে। দোষের মধ্যে এরা বড় নির্দোষ, বদমায়সির ঘোরপ্যাঁচ এদের মাথায় নেই। ডিগ্‌বি সাহেব আন্দামান দেখে বলেছিলেন এমন ইনোসেণ্ট মুখ কোন দেশের ক্রিমিন্যালদের দেখি নি।

ভরসা এই যে মান্নুর মত দু'চারটী আছে। ডিগ্‌বি সাহেবের কথাটা শুনলে ও লজ্জা পেতো। ওর দলের ঐ পাঁচ সাতজন সিক্যুরিটি বন্দী—অর্থাৎ ভারতরক্ষা আইনে দেশের নিরাপত্তার জন্যে বিনা-বিচারে আটক। আমরাও তাই, তবে ভিন্ন গোত্রের। আমরা পালিটিক্যাল, ওরা ক্রিমিন্যাল। ভদ্র ভাষায় বললে আমরা 'সিক্যুরিটি বাবু' ওরা

'গুণ্ডা সিকুরিটি'। ওরা কয়েদীর জাঙিয়া-কুর্তা পরে, কয়েদীর খানা খায়, কয়েদীর কাজ করে। আমরা ধুতিসার্ট পরি, ডিভিসন ডায়েট খাই আর ঘুরে বেড়াই উড়ে বেড়াই।

মান্নু কোলকাতার গুণ্ডা। সুনীল ধরা পড়ে ঢাকায়। গুণ্ডা, বাটপাড়, জুয়ারী, লম্পট, কোন ডিগ্রী ওর বাকি নেই। ওদের সংগে জুটল কোথায়—বাইরে না জেলে, পদমর্যাদায় কে বড়, এসব খবর জানিনা। অনুমান হয় সুনীলের মাথা আছে, ও মান্নুর পররাষ্ট্রসচিব কারণ সুনীলের গোপন আলাপ ছিল দু-একটী রাজনৈতিক কয়েদী ও সিকুরিটি বাবুর সংগে, যারা ধুতিপাঞ্জাবি পরলেও ঠিক বাবু নয়,—বর্ণচোরা আম, পাকা পঞ্চমবাহিনী।

মান্নু ঢেকিচালির পাহারা। যারা জেল দেখেন নি পাহারা কথাটা তাদের কাছে নতুন। বুঝিয়ে বলি।

শরৎ চাটুজ্জে বলেছিলেন—কসাইখানা থেকে গরুর চামড়া গাড়ি ক'রে বয়ে আনে গরুই। চলতি কথায়ও বলে—মাছের তেলে মাছ ভাজা। এই মহাজন ও প্রবচন বাক্যের ওপর জেলের শাসনবিধি প্রতিষ্ঠিত। কয়েদীদের হিসাব, গুন্‌তি, খাটানো, তল্লাসী, সাজাই, 'ধোলাই', ইত্যাদি কাজের পনের আনা করানো হয় কয়েদীদের দিয়েই। 'ধোলাই' কথাটা জেলের পরিভাষার শব্দ। কয়েদীদের মারধোর করার নিয়ম নেই। কিন্তু পুরু কম্বল জড়িয়ে যত খুসী পালিস দেওয়া যায়,—গায় দাগ না পড়লেই নিয়ম বাঁচে। বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীরা পুলিশের হেফাজতে থাকা কালে অনেকেই এই ধোলাই শিল্পের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছেন।

সাধারণ কয়েদীদের বলে ফাল্‌তু, কয়েদী অফিসারদের বলে পাহারা ও মেট। সামরিক কায়দায় বলতে গেলে প্রাইভেট, নন্‌-কমিশনড্‌ অফিসার এবং কমিশন-প্রাপ্ত অফিসার। পাহারা পদ অনুসারে পায়

কালো বিল্লা বা লাল বিল্লা, সেই অনুপাতে মার্কা বা মিয়াদমকুব আর জেলের কোন কোন জায়গায় গতিবিধির অধিকার। মেটরা পায় চামড়ার পেটি, সর্বত্র গতিবিধির সুযোগ। এরা কন্‌ভিক্‌ট্‌ ওভারসীয়র। কয়েদীদের যদি কুলি বলি তবে এদের বলা যায় কুলি-সর্দার। এরাই জেল চালায়।

এমন বহু সর্দারকে মান্নু চরিয়ে খায়। তবু সে পাহারা, কালো বিল্লা। মেটগিরি কথা বড় ঝক্‌মারি—জেলারকে আর বড় জমাদারকে বড় বেশী তোয়াজ করতে হয়। আর ওদের হয়ে মিহী হাতের কাজও হামেশা করতে হয়, নিজের হিস্‌সায় যা থাকে তাতে মান্নুর মত আমীর লোকের পোষায় না। পাহারাগিরির সুবিধেটুকু ভাঙিয়েই ওর কাজ চ'লে যায়। তার ওপর নামও আছে, হাতও পরিষ্কার। সেদিন ওর ফাইলের একটা লোককে মেরে ফেলল কি জানি কেন। জেলার টু শব্দটি করল না—কেস টেবিলে পর্যন্ত যেতে হয়নি ওকে। মান্নু কিন্তু তিনদিন খায় নি, অনুতাপে নয়—রাগে। বলেছিল—"বুকে এক ঘুসি খেলে মরে যায়, এই তাগদ নিয়ে শালারা জেলে আসে কেন?"

আমি বল্‌লাম—"সবাইত' তালতলার গুণ্ডা নয় ভুলে যাও কেন? পেটের জ্বালায় শরীকের মাঠ থেকে ধান তুলে এনেছে কিম্বা ক্ষেত নিড়িয়ে এসে পান্তা না পেয়ে ওর চেয়েও নির্জীব বউটাকে খুন করেছে। তারপর থানায় গিয়ে কেঁদে পড়েছে হাউ হাউ ক'রে। এখানেও খাচ্ছে ডাঁটাসেদ্ধ আর ডালের জল। তোমার মতো জোগাড় ক'রে ত' আর খেতে পায় না।"

মান্নুর চোখদুটো চিক্‌চিকিয়ে উঠলো। বল্‌ল—"শালার নসীব খারাপ।"

মান্নুও তবে নসীব মানে! না মেনে উপায় কি? ও ম্যাজিক

জানে। তাসে আর পকেটে ওর হাতসাফাই সমান। ও, সুনীল আর ঐ দলটা বহরমপুর জেলের চালান। ওখানে জেলভাঙার চেষ্টায় গুলিতে ওদের কয়েকজন ঘায়েল, কয়েকজন জখম হয়েছিল। বাকি পাণ্ডারা দু' কিস্তিতে ঢাকা জেলে আর এখানে চালান এসেছে। ঢাকায়ও তারপর ঐ একই কাণ্ড ঘটল, শুধু পুলিশ আগে খবর পাওয়াতে লোক মরল অনেক বেশী। তারপরই এখানে মান্নুকে বলতে শুনেছি—"দেখ্ সুনীল, তোর স্বদেশী শালাদের বিশ্বেস নেই।"

সুনীল আমাকে দেখে ওর দিকে চোখ টিপল। সংগে সংগে মান্নুর কথায় মোড় ঘুরে গেল। "এবার একটা কিছু করবে, এল ব'লে সুবাস বাবু।—এই যে বাবু সেলাম! কলকাতায় বোমার খবর কি বাবু? খিদিরপুর আর হাব্ড়া পুল নাকি উড়ে গেছে?"

বল্লাম—"বোমা ত' পড়েছে। কিন্তু স্বদেশী শালাদের বিশ্বাস নেই। সত্যি মান্নু সর্দার, এবার খুব হুসিয়ার।"

দু' জোড়া চোখে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ল। পলকের মধ্যে কী ভাষা বিনিময় হোল দু'জনার চোখে, কার সাধ্যি বোঝে। সুনীল বোকার মত হাসতে হাসতে চ'লে গেল—"বোমা পড়ে ত' এখানে পিঁপড়ের মতো মরতে হবে। তালার ভিৎরে কয়েদী হুসিয়ার হয়ে কি করবে বলুন।" মান্নু বল্লে—"সরম দিলেন বাবু, কিন্তু সাচ্ বাৎ বলি গোসা হবেন না। আপনারা সবাই সর্দার আর বেশী বাৎ বলেন। সবাই বোলনেওয়ালা, শুননেওয়ালা আর করনেওয়ালা কেউ নয়।.......কই, আনিয়েচেন গোল্ড্ ফ্লেক? আহা—হা খুলচেন কেন? প্যাকেটটা গোটাই দিন, ও শালাদের একটা ক'রে দিতে হবে ত'। আচ্ছা সেলাম।"

●

চা এল। পেছনে কাপ্তান।

"তোমার ঘুড়ি নামাও কবি। পিসীমাও আসছে"

একটা চেয়ার টেনে কাপ্তান বসল। রাইটিং টেবিলটা আর একটা চেয়ার, তিনটে কাপ পিরিচ বের করে আসগড় সাজিয়ে রাখল। বিদায় হোল আসগড় আলি। যাবার মুখে কাপ্তান বল্‌ল—"ম্যানেজার বাবুকে জলদি আসতে বলিস, চা জুড়িয়ে যাবে।"

মোহিতকে আমরা কাপ্তান বলি। আমরা মানে আমি, পিসীমা আর দু'চারজন। অন্যেরা বলে স্কলার, ফিলজফার ইত্যাদি। ও নাকি সব পড়েছে—ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌, রিলেটিভিটি, উপনিষদ, বেদান্ত। এতো পড়ে কিন্তু কোন তর্কে যায় না, দলের থিসিস্‌ লেখে না। সকলে ধ'রে নিয়েছে ও বিদ্যের জাহাজ, এত বোঝাই হয়েছে যে নড়বার শক্তি নেই। আমাদের কাঠ-বিপ্লবী সমাজে বিদ্যা বিপ্লববিরোধী (অবশ্যি বিদ্যা ফলানো নয়)। বিদ্বান পোষাকী সভ্য, 'কাজে' লাগে না। ধারণাটা পুরাতন। রুশো বলেছিলেন বিদ্যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ—চিন্তাশীল ব্যক্তি বিকৃত জীব। ফ্রান্‌সের বিপ্লব-পুরোহিতরা তখন মানুষের অন্তরকে ভুলে বুদ্ধির চক্‌চকে ছুরিতে শান দিচ্ছিলেন, তাই বিদ্যাবুদ্ধির ওপর রুশোর এই আক্রোশ। রুশো নিজে কাঠ-বিপ্লবী ছিলেন না।

স্কলার দুর্ণাম বরদাস্ত হয় না ব'লে মোহিতকে আমরা কজন কাপ্তান বলি। ও যে কোনদিন পল্টনে ছিল কিংবা জাহাজ চালিয়েছে তা নয়। কাপ্তানী বলতে যা বোঝায় তাও ওর আসে কিনা ঠিক বলতে পারি না, যদিও সুনীলের সংগে ওর খুব মাখামাখি। আসল কথা মোহিত ঘুঘু, পাক্‌কা বি-কেলাস, পঞ্চমবাহিনীর গরিলা। বিদ্যা আর ফিলসফারি ওর ছদ্মবেশ।

মনিদা হাড়ি-হেঁসেলের খবরদারি করেন। তিনি পিসীমা,

ঘরোয়া নয়—একেবারে সরকারি। চৌকার সবকটি ফাল্তুকে, এমন কি উচ্ছিষ্টপ্রার্থী বেড়ালগুলিকে পর্যন্ত না খাইয়ে তিনি জলগ্রহণ করেন না। কার পেটে কি সয় না, কার কোন হপ্তায় আধ সের ওজন কমল, এসব তথ্য তাঁর নখ-দর্পণে। ভালো খাইয়ে লোক কেউ চালান গেলে তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দেন।

সংসারের অক্ষম লোকগুলির ওপরে গিন্নীর দরদ থাকে একটু বেশী। আমাদের ওপর পিসীমার পক্ষপাতের কারণও তাই। তাঁর ধারণা খেতে মনে করিয়ে না দিলে কবি আর পড়ুয়ার খাওয়া হয় না, কতটা খেলে পেট ভরবে তাও ঠিক বুঝতে পারে না।

পিসীমার গরিলাগিরি আসে কিনা জানি না। তবে চৌকার ফাল্তুগুলো কিষ্কিন্ধ্যার বানরের মত তাঁর বশ, সেই সুবাদে সব কয়েদী তাঁকে মানেগনে। গেল পূজোয় বার শ' কয়েদীকে তিনি নিজ হাতে খাইয়েছিলেন। তারা আশীর্বাদ ক'রে বলেছিল বাবু অন্নপূর্ণা। কিন্তু কাপ্তানের কাছে পিসীমার এর চেয়েও বড় একটা সুপারিশ ছিল। পিসীমা জোগাড়ে লোক। এমন কোন অখাদ্য ছিল না যা হুকুম মাত্র তাঁর কাছে না পৌছতো। আর,—এটা অবশ্যি ঠিক জানি না, অনুমানে বলছি,—কাপ্তানের ফরমাসে হয়তো তিনি সিপাই ও অফিসারদের মারফৎ কিছু কিছু মিহী হাতের কাজ চালাতেন। জেলের পরিভাষায় পিসীমা কাপ্তানের দালাল।

আরো দুটী সাক্রেদ আছে ওর,—স্বামীজী আর ডাক্তার। অম্বুজদা গম্বুজদেহ, চুলদাড়ি রাখেন, নেংটি প'রে হঠযোগ করেন, ধুনা জ্বালিয়ে শীর্ষাসনে বসলে পশ্চিমে সেপাইরা ডিউটি ফেলে এসে তাঁর কাছে হাতজোড় ক'রে বসে। ঝানু বি-কেলাস মেটগুলো গাঁজা আর সিদ্ধি নিবেদন ক'রে স্বামীজীর কাছে প্রসাদ পায়। ননীগোপাল হোমিওপ্যাথ ডাক্তার—জেলারের দিদিমার বিশ বছরের গেঁটেবাত

সারিয়ে দিয়েছে। জেলের ডাক্তার সম্বন্ধে সেপাই-জমাদাররা মকবুলের সংগে একমত, তারা জেলের ওষুধ ফেলে দিয়ে চুপি চুপি ওর ওষুধ নিয়ে যায়। এই সূত্রে ওষুধ জোগাড়ও হয় অনায়াসে, ওষুধের নাম ক'রে আরো অনেক কিছু। সিকুারিটির (পলিটিক্যাল) মধ্যে আমরা চারজন। বাইরে কাপ্তানের আরো লোক আছে।

কি আছে ওর মনে কে জানে? আমরা কেবল হুকুম তামিল ক'রে যাই। অমূল্যদা আর ননীর বেশী ঝামেলা নেই। কিন্তু পিসীমাকে আর আমাকে বড় ঝক্কি পোয়াতে হয়। পিসীমা পারেন, ওই তাঁর কাজ। আমার দ্বারা ওসব হতে চা'য় না। কতবার বলেছি—"আমায় ছেড়ে দে, আর কাউকে দে তোর কাজ।" খুসী মেজাজে থাকলে বলতো—"তুই অকর্মা বলেই ত' তোকে দিয়ে সুবিধে।" মেজাজ ভাল না থাকলে গম্ভীর মুখে বলতো "বেশ।"

"আহা-হা বল না কি করতে হবে। বলছিলাম কি যদি আর কেউ—"

"থাক্" ব'লে উঠে চলে যেতো। যতক্ষণ না ওকে ফিরে পেতুম মনটা অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করতো।

কাপে চা ঢালতে ঢালতে বল্‌লাম—"ব্যাপারটা কিরে কাপ্তান?"

"ষ্টাফ টক্‌স্। পোয়েট, ফিলসফার আর ডিয়ার ওল্‌ড্ অণ্টি।"
(জংগী বৈঠক। কবি, দার্শনিক আর আদরের বুড়ি পিসীমনি)।

"চমৎকার জেনারেল ষ্টাফ। মান্নু তোদের খুব তারিফ করেছে জানিস? বলে স্বদেশী শালাদের বিশ্বাস নেই।"

"তারপর ?"

"বকশিষ চেয়ে নিলে। এক প্যাকেট গোল্‌ড্‌ ফ্লেক, আনকোরা।"

"গালাগাল দিয়ে বকশিষ ?"

"গালাগাল দেবে কেন শুধু ? বল্‌লে আপনারা সবাই নেতা, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে সর্দারি ফলান।

"ব'লে আবার গোল্‌ড্‌ ফ্লেকের প্যাকেটটা নিলে ? যেমন তুই হাঁদারাম।"

"উচিত কথা বলেছে, তা ব'লে পাওনাটা নেবে না ?"

"বটেই ত'। হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছে উচিত কথার মানেটা কি। মানিক একখানা।"

পিসীমা হাজির হলেন। র‍্যাপারের ভেতর থেকে বিড়ি, তামাক পাতা, ক্যাপ্‌স্‌টান, গোল্‌ড্‌ ফ্লেক, ইত্যাদির একরাশ বান্‌ডিল বের ক'রে সেল-এর ভেতরে যথাস্থানে রাখলেন গুছিয়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কাপটা টেনে নিয়ে বসলেন।

"নিমুর ব্যাপার শুনেছ' মনিদা ? তোমার সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট ফেল পড়বে।"

পিসীমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। বল্‌লাম—"বটম্‌লেস্‌ পিট্‌।"

"কুছ পরোয়া নেই। অতল গর্তের জন্যে অক্ষয় ভাণ্ডার আছে।"—বল্‌লেন পিসীমা।

মোহিত বল্‌লে—"খাবার টাকা থেকে বি-কেলাসি করবে আর আমাদের না খাইয়ে মারবে, এই ত' ?"

পিসীমার গৃহিণী-মর্যাদায় ঘা লাগল। "ইস্‌ কি খাবি বল না। আরে এই কে আছিস ?" পিসীমা পকেট থেকে বাজারের খাতা বের করলেন।

"আরে রোসো রোসো, খেপ্‌লে নাকি মনিদা ! কাজ রয়েছে যে।"

মনিদা সুস্থির হলেন। "কাজ রয়েছে।" এক কথায় আড্ডার লঘুত্ব কেটে গেল। থেমে গেল আলাপ, ধোনা তুলোর মত ফুরফুরে হাসিতামাসা। অজানা "কাজের" গুরুত্ব বুঝে তিনটে মন নিজ নিজ দুর্গে ফিরে এসে বর্ম আঁটতে লাগল।

সামনে সোনালী রসের পেয়ালা। ওপরে রূপালী বুটি-তোলা নীলাম্বরী রাত্রি। মধ্যিখানে কাপ্তানের কাজ। নেশার ত্র্যহস্পর্শ। একটা অদৃশ্য পরিবেশ, মৌতাত তিনজনকে ঘিরে জাল বুনছে, বুনে বুনে তিনটীকে এক ক'রে দিচ্ছে। স্তব্ধ সমধ্যানী সান্নিধ্যে মানুষ যেমন এক হয় এমন আর কিছুতে নয়।

"বল মনিদা।" মোহিত যেন বন্দুক ছুঁড়ল। মনিদা সিগারেট্টায় শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালায় বিসর্জন দিলেন। ছোট গলায় বিনা ভূমিকায় বিনা বিন্যাসে বলতে লাগলেন মোহিতের ফরমাসী কাজের কথা।

"খিদিরপুর, হাতিবাগান, ডালহাউসি এমনি জায়গায় জায়গায় পড়েছে। পাঁচ, সাত, দশ পাউণ্ড ক'রে এক একটা। বজ্‌বজ্‌, বেলঘরে, বরানগর এমনি সহরের বাইরেও কিছু কিছু। মনে হয় ডক, লালবাজার আর চটকলগুলোর ওপর নিশানা ছিল। লোক কিছু মরেছে, লোকসান তেমন কিছু হয় নি।"

"প্যানিক, ডিস্‌লোকেশন ?"

"ইভাকুয়েশনের হিড়িক লেগেছে। পিঁপড়ের মত লোক চলেছে রাস্তায়। রেলকোম্পানী মালগাড়িতে প্যাসেঞ্জার নিচ্ছে। এ সহরটাতেই লোক বেড়েছে তিনগুণ। তোমরাও দু'চার দিনেই টের পাবে। জেল-কন্‌ট্রাক্‌টার নোটিস দিয়েছে ছ' মাসের কেন, সাত দিনের জন্যেও বাঁধা রেট্‌-এ জিনিষ দিতে পারবে না। আজ বাজারে ফুলকপির পাতা বার আনা সের বিকিয়েছে।"

"মিলিটারির আপদ চুকেছে। আসল খবর বল। এসেন্‌সিয়াল সার্ভিস? ডিস্‌লোকেশন?"

"মুশ্‌কিলে ফেল্‌লে। এ সব খবর যে যার খুসী-মতো রং ফলিয়ে বলে। কারো কথা—এ. আর. পি-রা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে লোক বাঁচিয়েছে, কারো মতে কোল্‌কাতা সহরে তাদের পাত্তা নেই। তবে পশ্চিমে পুলিশ, জেল-ওয়ার্ডার আর মিলমজুর অনেক দেশে পালিয়েছে এ ঠিক।"

"অনুমান?"

"তা বলতে পারব না।"

"মিলগুলো চলছে? কাশীপুর? ইছাপুর?"

"জেসপ. কিছুদিন বন্ধ ছিল। সর্বত্রই কিছু চলছে কিছু বন্ধ, এই আর কি।"

"ট্রাম, বাস? মটর, রিক্‌শ।"

"তাও ঐ। তবে সন্ধ্যের পর সব বন্ধ।"

আমি শুনে যাচ্ছি। পেয়ালার চা-এর মতো এগুলো আমার কাছে হাল্‌কা নেশার পানীয়। কথাগুলোর একটা গূঢ় ইংগিত ও অজ্ঞাত সম্ভাবনা আছে বুঝতে পারি। কিন্তু তাতে আমার নেশা বাড়ে, উদ্‌বেগ হয় না।

মোহিতের তা নয়। কথাগুলো ওর জীয়ন রস। পান করার সংগে সংগে একমনে পরিপাক করে। একটা কথা সম্পূর্ণ হজম না হতে পরের কথায় যায় না। কাজের লোক স্বভাবত মিতবাক হয়। কিন্তু দেখি নি ওর মত মিতশ্রোতা। ওর কাছে কাজের কথা বলতে গিয়ে একটি বাহুল্য শব্দ মুখে আসে না।

মনিদার কথাগুলোকে আধ মিনিটটাক জারকরসে ভিজিয়ে নিয়ে বল্‌লে—"রেডিও কি বলে? টোকিও? সাইগঁ?"

"টোকিও সিভিল লোকদের বলছে সাতদিনের মধ্যে স'রে যেতে। ছোট বোমা ফেলার উদ্দেশ্য তাদেরকে সাবধান ক'রে দেওয়া। এরপর বড় বোমা ফেলবে মিলিটারির জন্যে। যারা কাছে থাকবে তাদেরও সংগে সংগে মরতে হবে—জাপান দায়ী হবে না।"

"আর ?"

"ভারতবর্ষ তারা আক্রমণ করবে না। আক্রমণ করবে ভারতীয় সেনা—ফ্রী ইন্‌ডিয়া লীগ।"

মনিদা পকেট থেকে খুব ছোট্টটো ক'রে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করলেন। একটার পর একটা ভাঁজ খুলে টেবিলে মেলে ধরলেন। বল্লেন—"ব্যারাকপুরে মিলিটারী ক্যাম্পের কাছে প্লেন থেকে লিফ্‌লেট ফেলেছে।"

লাল ইস্তাহার। হারিকেনটা একটু তফাতে ছিল। তার ক্ষীণ আলোয় নীচে আজাদ হিন্দুস্তানের অক্ষরগুলো পড়া যায়। আর—

"ও চিঠিটা তোর কিছুই হয়নি। শংকরের মায়া হচ্ছে দর্শনের রিলেটিভিটি। আইন্‌ষ্টাইন নৈয়ায়িক হ'লে অদ্বৈতবাদ বলতেন। দে দে, লিখিস আবার।" বলতে না বলতে মোহিত কাগজটা মুঠোর মধ্যে মুড়তে লাগল। আর মনিদা—"দুত্তোর আইন্‌ষ্টাইন। কপিপাতা আর কুমড়োবিচি খাবি, আইন্‌ষ্টাইন বেরোবে। দেখেছ শ্যামলাল কাণ্ডটা ?"

মাথায় আলাদিনের বাতি জ্বলে উঠেছিল। এতক্ষণে বুঝলাম। শ্যামলাল এসেছে তাই !

মোহিতের চোখ আমার ওপর। দ্ব্যর্থক ভাষায় বল্লে—"বোকাটা !"

শ্যামলাল পঞ্চমবাহিনীর পঞ্চম বাহিনী। মানে স্পাই। সিক্যুরিটির মার্কা জাল ক'রে আমাদের মধ্যে আছে। অবশ্যি এটা মোহিতদের সন্দেহ। আমি জানি না। হতেও পারে, ওর গায়পড়া আলাপ আর আই-বির সংগে মাঝে মাঝে সাক্ষাত এই দুর্নামের হেতু।

কোন রকম অভ্যর্থনা বা বসবার আসন না পেয়ে শ্যামলাল আমারই চেয়ারের হাতলে ব'সে পড়ল। আর যেন কত মাই-ডিয়ার লোক, "কি লিখেছেন নিমেষ বাবু, আমরা কি একটু শুনতে পাই না? রসিকসমাজে কি আমরা একেবারেই অচ্ছুত?"

পিসীমা বল্লেন, "রেখে দাও শ্যামলাল। তুমিও যদি কবির দলে ভেড়' তবে মারা যাব। বেরিয়েছি রবিবারের ফীষ্টের গেলাপ পোল নিতে, এরা বসিয়ে শোনাবে শংকর আর আইন্‌ষ্টাইন। তুমিই বলত' দই-এর পর কোনটা যুৎসই, তিলেখাজা না রাঘবসাই?"

শ্যামলাল ভুলবার পাত্র নয়। "ওসব তুমিই বুঝবে পিসীমা। খবর টবর বলনা কিছু। জাপানীরা নাকি লিফ্‌লেট ছাড়ছে?"

"তাই নাকি? কোথায় শুনলে?" ক্যাঁক্ ক'রে দুটি শিকারী কুকুর যেন এক সংগে নেকড়ের গলায় দাঁত বসিয়ে দিলে। অতি কষ্টে ছাড়িয়ে নিয়ে শ্যামলাল পালাল।

তিন জনে চুপ চাপ সেলে বসলাম। একটা মাকড়সা ছেঁড়া সুতোগুলিকে জুড়তে লাগল আবার।

"মনিদা!" মোহিত স্তব্ধতা ভাংল।

"একটি মালয়ী ঢাকা জেল থেকে চালান এসেছে। সু-হারজা। ফাঁসিখাতায় আছে, বেরুতে দেয় না।"

"বেরুতে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, এই ত?"

"পার ভালো। নয়ত' দেখা করিয়ে দিতে হবে।"

দু-জোড়া চোখের ঔৎসুক্য দূর করবার জন্যে মোহিত বল্‌লে, "ও বার্মা ফ্রন্টিয়ারে ধরা পড়েছে আনকোরা। তোমাদের লাল কাগজের চেয়ে খাঁটি খবর বলতে পারবে।"

আমি বল্‌লাম—"পারলেই বল্‌বে ?"

"তালার চাবি আমার কাছে আছে, যদি সে লোক ঠিক হয়।"

"তার বিশ্বাস কি ?"

"চাবি লাগালেই বোঝা যাবে। তা ছাড়া ঢাকা জেল থেকে খবর এসেছে। বল মনিদা—"

"হবে।" মনিদার কাছে এ কাজ সামান্য।

"সুবাদার কি বলে রে নিমু ?"

"Japan is come. I mean Indian troops. You say the white buggers will fight ? Never."

"এ ত' আরাকানি ভূতগুলো বলে।"

"আরাকানি ভূত আর শিখ অফিসার এ বিষয়ে এক। অটল বিশ্বাস আর বেপরোয়া কথা।"

মনিদা বল্‌লেন, "এ সবগুলো বাক্যবাগিশী ক'রে ডুবেছে। এগুলোর সংগে বেশী, মানে ইয়ে সাবধানে করিস।"

মোহিত—"পাকা লোক এর মধ্যে মাম্‌ আর সুনীল। টেক্‌নিক্‌ জানে।"

"নন্‌-টেক্‌নিক্যাল লোকগুলোকে দে না ছেড়ে। বিপদ বাড়ানো বৈ ত' নয়।"

"মেক্‌ দেম্‌ এ টুল।"

অসতর্ক অনুযোগের উত্তরে যা যা প্রাপ্য সবই পেলাম— শাসন, আদেশ, আলো। কিন্তু বুঝল না কাপ্তান আরো কিসের

অভাব। আমি আনাড়ি কারিগর, যন্ত্রের সাথে ঝগড়া করি। অস্বাভাবিক ওজন দিয়ে মোহিত কথাগুলি বলতে লাগল—

"সুবাদারের সংগে ভালো ক'রে কথা বল নিমু। আমাদের তাস না খুলে ওর হাতের তাস দেখতে হবে। ও কী চায় কী পারে, যদি তেমন কিছু হয় তবে ওর কী প্ল্যান। ডাজ্ হী মীন বিস্‌নেস্? এই।"

আমি সাত বাও জলের নীচে প'ড়ে গেলাম। আমাদের তাস, তেমন কিছু, বিস্‌নেস্। আমাদের তাস কি তাই জানি না। পাশের হাতের তাস লুকিয়ে দেখতেও শিখিনি। এ ক'দান চালিয়ে এসেছি কারণ পার্টনার কল্ নিয়েছে আমি ডামি হয়েছি। পাকা খেলোয়াড়ের পার্টনার ব'সে এবার গ্রহের ফেরে পড়লাম। প্রতিবাদ করলাম না—সে কাজ আরো কঠিন।

মনিদা বল্‌লেন, "আর একটা খবর আছে মোহিত। ওয়ার্ডাররা ষ্ট্রাইক করছে ১৬ই জানুয়ারী থেকে।"

"কেন?"

"মাগ্‌গি ভাতা, কন্‌ট্রোলের দরে চাল, কাপড় ইত্যাদি। দেবেনা গভর্ণমেণ্ট। ষ্ট্রাইক নিশ্চিত।"

"তারিখ ঠিক ক'রে ফেলেছে?"

"একেবারে পাকাপাকি।"

"চল্‌বে না। তারিখ হাতে রাখতে হবে।"

"উপায় নেই। অল্-বেংগল ব্যাপার। তা ছাড়া অন্য কোন ইস্যু'র সংগে এটা ওরা জড়াতে রাজি নয়।"

মোহিত চুপ ক'রে ব'সে রইল। তার পরিকল্পনার ভেতর কি যেন একটা ফাঁক আছে, কোথায় খুঁজে পাচ্ছে না। আবার ভালো একটা উপকরণ পেয়েছে কোথায় বসাবে খুঁজে পাচ্ছে না। একবার শেষ চেষ্টা করল—

"সময় ?"

"তাও ঠিক। লক্-আপের পর, রাত বারটায়।"

"হোলো না।—যেতে দাও। কি খাওয়াচ্ছ বল পিসীমা। তিলে-খাজা না রাঘবসাই ?"

আধোঘুমে রাত কাটছে। আমাদের তাস…যদি তেমন কিছু হয়…মীন বিস্‌নেস্।…কাপ্তান, মান্নু, সুনীল, সুবাদার, সু-হারজা… বোমা, ডিসলকেসন, ষ্ট্রাইক।…মান্নু টেক্‌নিক্ জানে…স্বদেশী-শালাদের বিশ্বাস নেই।…রাইডার হ্যাগার্ডের সংগে দেশান্তরী হয়েছি। মায়া-জালে ঘেরা ত্বঃসঙ্কিতা কল্পময়ী! একে একে পর্দা স'রে যাচ্ছে। এখনি আসবে সে বাস্তব হয়ে—অকুণ্ঠিতা, অনাবৃতা, বিদ্যুল্লতা! সন্ধানের নেশা কেটে যাচ্ছে, বুক কাঁপছে প্রাপ্তির ভয়ে।

কে "সে"? কল্পময়ী?—না নিরংকুশ সংকল্প? এ কল্পময়ী কি আমার ধ্যানে-দেখা কাব্যে-রচা সমাজলক্ষ্মী, না ত্বঃস্বপ্নপ্রসূতা ধ্বংস-প্রতীকা? বিদ্যুতের মত রূঢ় রূপ,—খরধার সম্মোহিনী, যার বিচ্ছুরণে ঝল্‌কায় সংগ্রাম, স্বাধীনতা, বিপ্লব, গণমুক্তি,—কে সেই অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তি আমাদের নিরালম্ব গ্রহটীকে নিয়ে খেলছে? এলাঁ ভিতাল, না উইল্-টু-লিভ, না উইল্-টু-ওয়ার? উৎক্ষিপ্ত হবার অন্ধ উদগ্র প্রেরণা? সারা পৃথিবীর ওপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় বয়ে যায়, অখ্যাত এই কারাগারের প্রাচীর ডিঙিয়ে তার ঝাপ্‌টা এসে লাগে বন্দীর বুকের পাটে। সংগ্রাম, সংকট, মৃত্যু, এদের মধ্যে কী ত্বর্নিবার নেশা! কার তাগিদে ছুটছে এরা?—বাংলার কেরাণীর ছেলে,

জলন্ধরের শিখ চাষী, বিহারের পথে-ভাসা চোর? দেশ, গণ, না
বজ্রগর্ভা বিদ্যুল্লতিকা?

অষ্ট্রেলিয়ার অরণ্য। পশু এখানে নগ্ন। নৃশংসতার গায় নীতির আবরণ নেই, কাব্যের অলংকার নেই। সর্পিণী সদ্যপ্রসূত সন্তানগুলিকে গিলে ফেলছে। স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষ-মাকড়সার সংগে যৌনসংগমের পর তাকে ভক্ষণ করছে। কাঠপিঁপড়ের জাঙাল চলেছে—একটীকে কেটে দু'খণ্ড করে দাও, মাথা ও ল্যাজে মারামারি লাগাচ্ছে—মাথার দাঁত, ল্যাজের হুল। সবার উপরে বিরোধ সত্য তাহার উপরে নাই,—ঠিক, বলেছেন হেগেল, মার্ক্‌স্‌, শপেনহয়ের, নীট্‌শে। প্রমাণ করছে জাপ, জার্মাণ, রুষ, ইংগ। বিশ্বদহা বহ্নিস্রাবের ফিন্‌কি এখানেও জ্বলছে—পুলিশ আর স্বদেশী, ইংরেজ আর আরাকানি, ষ্টাফ আর কয়েদী—এক কথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর পঞ্চম বাহিনী।

প্রমিথিউস আগুন চুরি করেছিল,—আজও মানুষ সেই চোরাধনের দায় বুকে বয়ে ফিরছে। বুকের আগুনকে হাতের মুঠোয় ধরবার জন্যে মৃত্যুর দ্বারে প্রার্থী নচিকেতা—অগ্নি পেয়েছি, দাও অগ্নিবিদ্যা, সপ্তজিহ্বা স্ফুলিংগিনী বিশ্বরুচি দেবীকে জানতে চাই। মৃত্যু বলছে—বংশ, হিরণ্য, ভূমি, নারী সব নাও, অর্থাৎ তুষ্ট হও অগ্নির ইন্ধন নিয়ে, কিন্তু মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ--মরণের উত্তর চেও না।

কাপ্তানের কাজ ফেলে রাখা যায় না। চৌবাচ্চায় সাঁতার কাটতে যাবার পথে সকালে বড় গুদামের সামনে সুবাদার সাহেবের সংগে দেখা হয়। "বাবুজী নমস্তে, আচ্ছে হ্যায়?" "জী, নমস্তে। আপ

আছে হ্যাঁয় ?” “বিল্‌কুল আচ্ছা, একদম।” দু'হাত তুলে বলতেন সর্দারজী।

সুবাদার রছপাল সিং শিখ রেজিমেণ্টের অফিসার। ব্রহ্মসীমান্তে সেনাদলে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তিনজন অফিসারের কোর্ট-মার্শাল হয়। দুজনকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল, আর এই একজনের দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছে। এঁকে ডিভিসন টু দেবার হুকুম হয়েছিল, কিন্তু ইনি সে সুবিধা প্রত্যাখ্যান ক'রে তৃতীয় শ্রেণীর খানা খান, পোষাক্ পরেন, আর শিখ সৈনিক কয়েদীদের সাথে থাকেন—তাই দু'হাত তুলে একটু বেশী জোর দিয়ে বল্‌লেন—“বিলকুল আচ্ছা হায়, একদম।”

কুশলপ্রশ্নের পরেই সর্দারজী একেবারে আসল প্রশ্নে চ'লে যান—“কোই তাজা খবর ?” মানে, রেডিওর খবর। আজ লাল ইস্তাহার সাথে ছিল, দিয়ে বল্‌লাম—“গুরুমুখমে দেখিয়ে।” কিন্তু এসব জিনিষে তাঁর তর সয়না। আমাকে এক মিনিট সবুর করতে ব'লে চ'লে গেলেন। ফিরে এসে বল্‌লেন—“নাউ ইউ আর কন্‌ভিন্‌সড্ ?”

তর্কের মধ্যে গেলে আর রক্ষে নেই। “মান লিজিয়ে উওলোক আ-জায় ইয়া য়হী জগহ বোমা গিরে ত' আপ্‌কা কেয়া ইরাদা ?”

“বাবুজী সবুর করো। আজাদ হিন্দি আ-জায়েংগে ত' কাম্ বতায়েংগে।”

“আওর উস্‌কা পহ্‌লেহী বোমা গিরে ইয়া হল্লা মচ্ যায় ?”

“পরোয়াহ্ মৎ করো, হম্ হায় আওর পল্টনকা চালিস আদমী হায়। দে উইল মুভ্।”

“আয়সী বাত খুলম্ মৎ বোলিয়ে। ফির ভি ফিফ্‌থ্ কলাম চার্জমে গির পড়েংগে।

“আপস্‌কী বাত। আজাদীকা পাস ছিপানেকী কোই বাত নহী।”

"হর আজাদিয়োঁকা ইয়হ্‌ কাম পসন্দ্‌ নহী। কোই কোই ইসিকো বুরা কহতে হ্যায়।"

"এমং পলিটিক্যাল প্রিস্‌নার্স?"

"এমং পলিটিক্যাল প্রিস্‌নার্স।"

সর্দারজীর বিস্ময়ের ভাব একটা বিস্ময়ের বস্তু। তাকাবার ধরণ দেখে মনে হয় তবে তোমাকেই বা বিশ্বাস কি? বল্‌লাম—"নহী তো হম্‌নে জেলমে কেওঁ আয়া, আপকাভি কিস্‌ ওজহ্‌সে ইয়হ্‌ হালত?"

ধাক্‌কাটা তখনো তিনি সামলে উঠতে পারছিলেন না। হাতে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লাম—"হামে সাথ লেনা, সম্‌ঝে?"

চৌবাচ্চার দিকে হাঁটা ধরলাম। ভোর হয়েছে। নম্বরের তালা খুলেছে। সারি সারি কয়েদী বেরিয়েছে। পরণে জাঙিয়া কুর্তা টুপি, বগলে কম্বল-মোড়া কয়েদীপোষাক, হাতে টিনের থালাবাটি। কেউ সারি বেঁধে ফাইলে বসেছে পাহারার জিম্মায়, কারো গুন্‌তি হচ্ছে, কোন দল চলেছে নিজ চালির দিকে খাটতে। চৌরাস্তায় ঘেরা পার্কের মত এ জায়গাটি জেলের কেন্দ্রস্থল। পাশেই ইন্‌ডোর গেট, একটু দূরে সাম্‌নে বড় গেট। ভোরবেলা সারা জেলের কয়েদী-সমাগমে জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মাথার ওপর সাঁ করে এক ঝাঁক উড়োজাহাজ এসে পড়ল। সংগে সংগে সমস্ত ফাইল ছত্রভংগ আর তুমুল হল্‌লা।—যেন উড়ো-জাহাজ যখন তখন নিশ্চয় জাপানী, এই বোমা পড়ল ব'লে, আর বোমা ত' বোমা নয়, লাড্‌ডু। কয়েদী, পাহারা, মেট, সিপাই, জমাদার মুহূর্তে যেন বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে সবাই ভাই ভাই একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু প্লেনগুলো এই সাদর সম্বর্ধনার দিকে দৃক্‌পাত করল না। সিপাই-মেট্‌ বিরক্ত হয়ে বে-ফাইল কয়েদীগুলোকে

দু-চারটে গালিগালাজ আর চড়চাপড় দিয়ে বৃহগুলিকে পুনর্গঠন করল।

শুধু একটি লোক খট্ খট্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছিল কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, না আকাশে না আশ্রমে। সেই কালো ছোট্‌টো মানুষটী,—মান্নু।

ঢেকিচালির মাঠের কাছে এসেছি। একদল আরাকানি সিক্যুরিটি বেরিয়েছে,—বাগানের কাজে যাবে। জাপানীরা আসবার সময়ে সুবিধে পেয়ে এরা লুটপাট খুনখারাবি করেছে, তাদের খবর টবরও বোধ হয় কিছু কিছু দিয়েছে। পিছু হটবার সময়ে ইংরেজ ফৌজ যে কয়টাকে পেয়েছে ধ'রে এনে বেশীর ভাগ কতল করেছে, দু'একশো এধার ওধার চালান দিয়ে রেখে দিয়েছে।

"বাবু, জাপান আয়া ?"

"জাপান হার গিয়া।"

অবিশ্বাস্য। গালভরা মংগোলিয়ান হাসি দেখিয়ে বল্‌লে—"কব্‌বি নেই কব্‌বি নেই।"

চটাস্ ক'রে এক বিরাশী সিক্কা ওজনের চড় পড়ল মগ দস্যুর গালে। "শালা জাপান তুমারা বাপ হায় ? ভাগো।"

আমূল-বিকশিত দন্তের ওপর আকর্ণ-বিস্তৃত ওষ্ঠ আস্তে আস্তে গুটিয়ে এল। তরমুজের বিচির মতো চেরা চেরা আধ-বোজা চোখগুলো গোল হয়ে উঠল। আহত আরাকানি গালে হাত বুলোতে বুলোতে চ'লে গেল সদলবলে। কেউ একটা কথাও বলল না।

চড়টা কসিয়ে মান্নু বল্‌ল আমাকে—"ও লোকগুলোকে সাবধান বাবু, ওরা হয় আহাম্মক নয় বদ্‌মায়েস।" কাজ ও কথা সব চলার পথে, থামল গিয়ে একেবারে তার সেই তিনহাত কৃষিক্ষেতে।

বিশ পাকের বদলে আট পাকে শেষ ক'রে লোকসানি সময়টাকে

পুষিয়ে নিলাম। পদ্মার পাঁচিল-পেরুনো হাওয়া আর টাট্‌কা শাল ফুলের গুড়ো দিয়ে ফুসফুসজোড়া সারাদিনের কাজ চালাবার মতো তেজি ক'রে সেল-এ ফিরে এলাম। বাকি অরগ্যানগুলোকে চাঙা করবার জন্যে প্রভাতী চা আর খবরের কাগজ নিয়ে বসলাম।

ঠিক এই সময়টিতে নাদির মহম্মদ আসে। আসে একটা সাহিত্য-সোপান নিয়ে পড়া বুঝতে। কিন্তু তার ভূমিকা—"বাবু, কাগজে ল্যাক্‌সে কি? জাপান আইল নি আমাগর ছ্যাশে, কয়ন চাইন।"

নাদির কুমিল্লার গাঁয়ের ছেলে।—এ-কেলাস হলেও পাক ধরেছে, বি-কেলাস হবার আশা রাখে। ছেলের ভবিষ্যত ভালো, উদ্যম আছে। ওর ভরসা জাপান এলে ওর নিজের লাইনে শাইন করতে পারবে। তা হলে আর সাহিত্যসোপানের বিড়ম্বনা সইতে হয়না। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে ঐ লাইনের কাজ-কারবারের অসুবিধা। বরং মুসলমানের ছেলে, দু-চার পাতা লেখাপড়া শিখলে আজকাল চাকরির ভাবনা নেই। তাই পরম উৎসাহে ডিভিসন টু'র চৌকার কাজ ফাঁকি দিয়ে ও বই নিয়ে বসে। বুদ্ধি ও চেষ্টা বেশ আছে। এক বছরে বর্ণপরিচয় থেকে চ'লে এসেছে সাহিত্যসোপান পর্যন্ত।

কিন্তু যেদিন বেশী বোমার গল্প শোনে কিম্বা বেশী জাহাজ ওড়ে সেদিন ওর মনে হয় যত্নচেষ্টার চেয়ে জন্মগত প্রতিভার পথটাই ভালো। বলে—"আল্লায় করে জাপান আইয়ে।" আমি বলি—"না হে আল্লায় তোমাগর পক্ষে না, আল্লায় আংরেজের পক্ষে। জাপান হারতে লইসে।"

সারাদিনে আর উড়োজাহাজ আসে নি। নাদির পড়া ফেলে দু'চার বার বাইরে এসেছে, কিন্তু আকাশ ফাঁকা। সন্ধ্যায় লক্-আপের আগে নতুন উৎসাহ সঞ্চয় ক'রে পড়া বুঝতে এল। বুঝে নিয়ে বল্‌ল,—"বাবু হাকিমরা কি পাস?"

"মেট্রিক।"

"আচ্ছা কয়ন্ চাইন্: আমি আর কয় বচ্ছর পড়লে মেট্রিক পাস দিয়াম ?"

হয়তো এও বিধাতার খাতায় লেখা আছে। হায় রে নিয়তি! কাপ্তানের মতো কতো ছেলে হাকিমী ফেলে জেলে ছুটে এসেছে। আর চাষীর ছেলে এ-কেলাস নাদির হাকিমীর স্বপ্ন দেখছে। ধন্য ইংরেজ রাজনীতি।

ততক্ষণ নাদির সেল্এর ভেতর ব'সে একমনে পড়ছে,—"ধয় ঋ, ত, রয় আকার, মধ্যন্যষয় টয় আষ্ট, রফলা,—দীবৃ-ত-রাস্ট।"

অম্বুজদা ধ্যানে বসেছেন। না, বসেছেন বললে হবে না,—ধ্যানস্থ হয়েছেন। তিনি শীর্ষাসনে, ঊর্ধ্বপদ নিম্নতুণ্ড। সামনে সাষ্টাংগপ্রণত একটী ভক্ত। দুটীই লম্বমান শালপ্রাংশু-বপু। ধুনার আগুন আর ধোঁয়া ঘর ছেয়ে ফেলছে। ধ্যানভংগ হলে অম্বুজদা অম্বুদনিনাদে গণ্ডধ্বনি করলেন—ব্রু····ববম্ ববম্ ববম্। ভক্তটি কৃতাঞ্জলি হয়ে বসল। আর একরকম মিহি ধোঁয়া বেরুল ঘর থেকে।

স্বামীজী গীতাপাঠে বসলেন। 'সিদ্ধি' লাভ ক'রে ভক্তটি দেখি আমার কাছেই এল। ভিখনলাল।

ভিখনলাল ঢেকিচালির মেট্। জেলতন্ত্রে মান্নুর ওপরওয়ালা, কার্যত ওর আজ্ঞাবাহী সাকৃরেদ। এর সংগে আমার চোখের চেনা, কোন রকম আলাপ নেই। অম্বুজদার আখড়ায়ও ওকে এই প্রথম দেখছি। ব্যাপারটা একটু বিস্ময়ের।

"ভিৎরে আস্থন বাবু।"

অন্ধকার সেল্‌-এ এসে বসলাম।

"মান্নুকে ঢেকিচালি থেকে তাঁতচালিতে বদ্‌লী করেচে। শালা নতুন জেলারের কাজ।"

"কেন ?"

"কেমন ক'রে বলি বাবু ? কিছু সন্দ টন্দ করে হয়তো বা। তাঁতচালির মেট আজ্রাদ বক্‌স্‌ জেলারের দালাল। মান্নুকে বেরুতে দেয় না।"

"ছোঃ"

"সাচ্‌ বাবু। তবে পারবে না, ও বেরুবে ঠিক। আপনাকে খবর দিতে বল্‌লে, আর এটা আপনাকে পাটিয়ে দিয়েচে—সাবধানে রেখে দিন, দেখবেন না।"

তিনটে দার্জিলিং চা-এর প্যাকেট একেবারে সীল করা, যেন সগু দোকানের।

"তা হয় না ভিখন। মান্নু আমাকে কিছু বলেনি। আর ওতে কি আছে না জেনে আমি রাখতে পারি না।"

"আপনাকে দেখা করতে পারলে ত বলবে ? আচ্ছা বলচি কি আচে।" মুখ কাছে এনে নীচু ক'রে বল্‌ল,—"গিনি আর চরস।"

এমন স্থযোগ পেয়েও গোয়েন্দাগিরি করবো না এতো বড় কবি আমি নই। "সে কি ? ও কোত্থেকে পেলে ? কি হবে ও দিয়ে ?"

"মান্নু সর্দারের দোস্‌ত্‌ বাবু যেন কিছু জানেন না।" অন্ধকারে অনুমান করলাম ভিখনের মুখে অবিশ্বাসের হাসি।

"ঠিক বলছি জানিনা কিছু। আর কি হবে ও দিয়ে, না জানলে ও সব আমি রাখবও না।"

"তা হলে শুনুন। ওটা আমাদের পুঁজি আর ব্যবসার মাল।

বি-কেলাসরা সব গিনি রাখে আর চরস খায়। আমরা জোগাই, ওরা গিনি ভাঙিয়ে কিনে নেয়।"

"যখন তখন তল্‌লাসি হচ্ছে, গিনি রাখে কোথায় ?"

"খোপরে। গালের নিচে গলার পাশে গর্ত ক'রে। এও জানেন না বাবু, জেলে আচেন!"

"চরস বেচে কী লাভ ?"

"মাছ, মাংস, দুধ, তারপরে গেলাস-টেলাস যেমন খুসী পাওয়া যায়। শরীল্‌টাকে রাখতে হবে ত', দেখচেন না একটুও পদাথ্‌থ নেই ?"

"ঠিক, ঠিক। তারপরে স্বামীজী টামিজীর পায়ও ত' কিছু ভোগটোগ দিয়ে ধর্মটা রাখা চাই।"

"হেঁ হেঁ, এই ত' বাবু সবই বোজেন।"

"বুঝি বই কি। এত' কেবল লেনদেন। কিন্তু ব্যবসা কেন ? গিনি জমিয়ে লাভ কি ?"

"চোরের কারবার বাবু। কিচু থাকে না। দিতে থুতে ফুরিয়ে যায়। শালা জেলার থেকে জমাদার সেপাই, এত দেওতার প্রণামী দিয়ে কী থাকে বলুন ত!"

অন্ধকার সেল। দুজনে চুপচাপ্‌ ব'সে আছি। ভিখন কষছে লাভ-লোকসানের খতিয়ান, না হয় খুঁজছে দেওতার প্রনামী ফাঁকি দেবার ফিকির; কিংবা হয়তো ভাবছে তার পদার্থহীন শরীরটাকে কি খাইয়ে তাজা রাখা যায়। ঘানি, ঢেকি, জাতা, তাঁত, বাগান, টিউবওয়েল এসব জায়গায় খাটছে এ-কেলাসের দল,—বৌ-ঠেঙানো, বুড়ো বাপের মাথা ফাটানো, কিংবা হাটনৌকো লুঠকরা অর্ধভূক্ত চাষীডাকাতের দল,—যারা ভোরবেলা ফাইল বেঁধে বেরোয়, এরোপ্লেন দেখলে ফাইল ভাঙে আর রুলের গুতো খায়, ফাঁক পেলে একটা বিড়ি চায় যেন

অধেক রাজত্ব চাইছে—সেই কয়েদীদের দরিদ্র খানার ওপর বেপরোয়া ব্যবসা চলছে বি-কেলাস কয়েদী আর উর্দিপরা রক্ষকদের মধ্যে। নিত্যিকার মত মকবুল আজও কাসছে আর গাইছে পাশের সেল-এ—

খাওয়া-কারা বিদায়ঘটা বিরাট আয়োজন
এককাঠা ডাউল এককাঠা ভাত তাতে খুসী মন
মোদের মতন পরম সুখে কে আছে ভাই মণ্ডলে
জেলখানাতে দুঃখে আছেন কেয় বলে ?

"এই কয়েদীগুলোর খাবার থেকে কতই আর মারতে পারো তোমরা ? কী বা ওরা পায় ?"

"না বাবু, আরো আচে। আরো জোর ব্যবসা আচে। সে এখন থাক। আমি বলি গিনি খাটা গতর রাখ্। কি হবে জমিয়ে ! কিন্তু ঐ সুনীল গিনি জমিয়ে নোট করচে। ঐ সব ভদ্দরলোক চোর আমার পসন্দ হয় না। কোনদিন নোটফোট ধরা পড়লে সব গেল। আপনি যদি মায়ুকে ব'লে......"

বাইরে পা-এর আওয়াজ শুনে ভিখন থামল। সেল-এর সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন নতুন জেলার—অন্ধকারভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ভিখন ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম দিল।

"শালা পয়লা নম্বর খচ্চর। বে-টাইমে দেখে গেল, কেস টেবিলে হাজির না ক'রে দেয়। যাই বাবু, মাল সামলে রাখবেন। মায়ু দেখা করবে আপনার সংগে।"

"শুনে যাও। কত আছে এতে ?"

"বেশী নয়। একশ' গিনি।"

সু-হারজা'র ফাঁসি হয়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন, ডিভিসনাল কমাণ্ড-এর অফিসার এলেন। কতকগুলি নথীপত্র পরীক্ষা ক'রে কি জানি কেমন একটা আদালত পাঁচমিনিটে সাব্যস্ত ক'রে ফেলল তার অপরাধ। দিনক্ষণ দেখে মালয়ী গুপ্তচরের ফাঁসি দেওয়া হোল।

যাবার আগে কাপ্তানের কাছে ওর সম্পত্তি রেখে গেছে। একদিন আমাকে দেখাল।

পূর্ব-ভারতের মিলিটারি ম্যাপ। কয়েকটা জায়গার নামের নীচে লাল দাগ, কয়েকটার নীচে নীল। এককোনে সাংকেতিক দিয়ে বোঝানো—লাল দাগ মানে এয়ার বম্‌বিং, নীল দাগ মানে ল্যান্‌ডিং পয়েণ্ট। সবগুলি জায়গার পাশে তারিখ লেখা, খুব অস্পষ্ট। বোঝা যায় যে অদৃশ্য কালির ওপর কোন প্রলেপ দিয়ে অল্পক্ষণের জন্যে উদ্ধার করা হয়েছে।

একটা লাল-দাগ-দেওয়া নামের নীচে কাপ্তান আঙুল দিয়ে দেখাল। "—দি জংসন,—।২।৪৩"

"এর ওপর এতটা নির্ভর করবি?"

"না, তারিখের ওপর কখনই নির্ভর করা যায় না। তবে ওর কাছাকাছি সময়ে কিছু হয়ে যেতে পারে। প্রস্তুত থাকা দরকার।"

"প্রস্তুত থাকা না-থাকা আমার ভাবনা নয়। যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

"কবিত্ব রাখ। এবার কাজ হাতে নে।"

কাপ্তান আর একটা কাগজ বের করল। জেলের ম্যাপ। সব

আছে—ঢেকিচালি, তাঁতচালি, ঘানি, গুদাম, আর্মারি মায় ক্যাস। এরও কয়েকটা জায়গায় দাগ দেওয়া।

"আর্মারির নীচে ডিনামাইট বসিয়েছে। ওর ফিউস্-টাকে মাঝখানে নষ্ট ক'রে রাখতে হবে। সুবাদার ইজ্ দি ম্যান ফর ইট্।"

"আর্মারি ত' দেয়ালের বাইরে।"

"না,—বাইরে কেন, ভেতরে থাকবে আর জেলার তোমার হাতে কাঁচি দিয়ে বলবে নাও ফিউস্টা কেটে দাও।"

হেসে ফেল্লাম। ঠাট্টায় আমার লজ্জা হয় না। আমার স্বদেশী ঐ দরেরই।

"আমাকেও জানো সুবাদারকেও জানো। এসব কাজে দুটোর একটাও লায়েক নয়।"

"আমাদের সুবাদার, জেলের আর্ম্স্ সুবাদার দুজনেই শিখ। ও রছ্পালের খুব বাধ্য। তা ছাড়া আরো সিপাই জমাদার আছে, রছ্পাল পারে চেষ্টা করলে। বলিস দরকার হলে টাকার অভাব হবে না।"

"মনিদা?"

"ত্যাখ্, হয় না। মিলিটারির কাজ মিলিটারি দিয়ে। বুঝিস ত' ষ্টোর আর আর্মারি দুটো চাই-ই। মণিদা প্রথমটার সন্ধানে আছেন।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। আমার শরীরের তারগুলি কতো পাওয়ারের বিদ্যুৎ বইতে পারে তার পরীক্ষা চলছে একটু একটু ক'রে। স্নায়ুগুলোই যেন কেমন। কখনো একেবারে বিগড়ায় না। কিছুক্ষণ ধপ্ ধপ্ ক'রে লাফায় তারপর সামলে নেয়।

"মাম্নুর খবর শুনেছিস্?"

"হাঁ। কেন যে জেলারের রোখ পড়ল! মাম্নুটা আবার যে রগচড়া, একটা গোলমাল বাঁধিয়ে সব ভেস্তে না দেয়।"

"আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে। আর মাল।"

"কি মাল ?"

"গিনি আর চরস। একশ' গিনি।"

"কার হাতে পাঠালে ?"

"ভিখনলাল।"

"কাছে রাখিস নি ত' ?"

"না। ঠিক জায়গায় আছে। ভাবনা নেই।"

"ব্যাপারটা কেমন কেমন লাগছে রে। এক কাজ কর।"

আবার চুপ। প্রতীক্ষায় ব'সে আছি। তুমি ডায়নামো। কতো ভোল্ট্-এর কারেণ্ট তুলতে পারো জানি না। আমি তার মেলে ব'সে আছি। যত খুসী কারেণ্ট ছাড়ো। তার পুড়ে গেলে আমার দোষ নেই।

"তোর পাইল্‌স্‌টা কেমন আজকাল ?"

"অনেকটা ভালো।"

"একটু বাড়াবি। বাড়িয়ে হাসপাতালে যা।"

"তথাস্তু। পিসীমাকে দিয়ে ঝাল্-মস্‌লাদার কালিয়া আর কাসুন্দ'র চাটনী পাঠিয়ে দিস্। মরতে হয় ত' খেয়েই মরি।"

"না, দেখ্—ঠাট্টা নয়। নতুন জেলারটার কিছু মতলব আছে। হ'তে পারে আই-বি-র লোক। আমাদের গণ্ডিটা বেড়ে যাচ্ছে, টেনে রাখতে হবে। হাসপাতালে গেলে সুনীলকে পাবি। মানুর সংগে যোগাযোগ রাখতে ভিখনকে লাগবে না।"

"বেশ। ত্বয়া হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। তবে ভাই পিসীমাকে ব'লে অসুখ করবার ওষুধ, আর ননীকে ব'লে অসুখ সারাবার ওষুধ ঠিক ক'রে রেখ। হাসপাতালে গিয়ে জেলের ডাক্তারের হাতে মরতে পারবো না। জেলের ডাক্তার—"জ্বর হইলে রোগ চিনে না গিলায় কুইনাইন বড়ি।"

১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৩। গত রাত বারোটা থেকে ওয়ার্ডাররা ষ্ট্রাইক সুরু করেছে। সকালবেলা নম্বরের তালা খোলে নি। সিক্যুরিটি ইয়ার্ডও বন্ধ। আমিও সেল্-এ তালাবন্দী। দরজার গরাদ ধ'রে ছোট্টো আকাশের ফালিটুকুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, যদি আসে আমার প্রাতর্ভোজ শালমদিরা নিয়ে পদ্মার হাওয়া।

বেশীক্ষণ থাকতে হোল না। সিক্যুরিটি ইয়ার্ডে হৈ চৈ হচ্ছে। প্রাতকৃত্য, রান্নাবাড়া, ইত্যাদির প্রয়োজনে তালা খুলে দিতে হোল। বাইরে জেলের চারদিকে ততক্ষণ রিজার্ভ পুলিশ মোতায়েন হয়েছে।

সিপাই নেই, কাজেই সর্বত্র অবাধ্ গতি। সাধ মিটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিড়ি আর তামাকপাতা রসদ নিয়ে বেরিয়েছি সমুদ্রযাত্রায়।

প্রথমেই গেলাম তাঁতচালি, মান্নুর খোঁজে। পেলাম না। ওখানে নেই। ওকে সরিয়ে নিয়েছে, কেউ বলতেও পারে না কোথায়। মরুক গে। মান্নু সুনীল সুবাদার এসব আজ নয়। আজ কাজ নয়, ছুটি—সমুদ্রবিহার।

ফাঁসিখাতায় কয়েকটা বর্মী—ষোল বছরের ছেলে থেকে আশী বছরের বুড়ো পর্যন্ত। পূর্বসীমান্তে সামরিক আদালতে এদের বিচার ও প্রাণদণ্ড হয়। তারপর যখন ইংরেজ সৈন্য পিছু হ'টে আসে তখন বহু লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র, মালরসদের সংগে ঐ বিচারের নথীপত্রও যায় হারিয়ে, বিচারকদেরও আর পাত্তা পাওয়া যায় না। কিন্তু আসামীগুলোকে ছাড়া হয় নি। এরা দুর্ধর্ষ বিপ্লবী, থাকিন দলের

লোক। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে বিচারের রায় ছাড়া ফাঁসি দেওয়া যায় না। নতুন ক'রে বিচার করতে গেলে সাক্ষীপ্রমাণের জন্যে যেতে হবে সালুইন নদীর পারে। তা ত' আর ব্রহ্মদেশে ফাসিনিপাত আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে হয় না। কাজেই বছর খানেক যাবত এরা মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে ফাঁসিখাতায়। রোজই ভাবছে হয়ত' বা কালই। স্থ-হারজার ফাঁসির পর এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে,—যাক্, তাহলে আর দেরী নেই।

আমাকে দেখেই লোকগুলো আমার ওপর চোখ রেখে সেল্-এর মধ্যে পিছু হটতে লাগল। ভেবেছে আমি মৃত্যুদূত—শেষকৃত্যের পরোয়ানা নিয়ে এসেছি। ইংরেজি হিন্দী কোন কথা বুঝল না। দৃষ্টির মধ্যে বুদ্ধির ক্ষীণতম আভাসটুকুও যেন নেই, একেবারে আতংক ও বিভ্রমে ভরা।

গেলাম জালে,—বিখ্যাত দস্যু দুর্গা হালদারকে দেখতে। ঠিক সেল্ নয়, বরং গর্ত বা খোপ। জেলখানার আইনকানুন যারা মানতে চায় না তাদের সায়েস্তা করবার জন্যে এই জাল-ডিগ্রীতে রাখা হয়। নতুন সিপাই-মেট্কে ধোলাই শিল্প শিক্ষা দেবার পক্ষে এখানকার স্থান ও পাত্র প্রশস্ত। মালদ'র দস্যু দুর্গা হালদার এখানে আছে। পঁয়ত্রিশ বৎসরের মিয়াদ, ডিভিসন থ্রী। সর্দারোচিত খানা দাবী ক'রে সে পায় নি, তাই পাঁচ বছর ধ'রে অনশন করছে। অসুরের মতো জোয়ান, জোর ক'রে তাকে খাওয়ানো যেতো না। অগত্যা ইন্জেকশন দিয়ে তার পা দুটো অবশ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রত্যহ রবারের নল দিয়ে তরল আহার চারপাঁচজনে জোর ক'রে খাওয়ায়। এইমাত্র সে পাট শেষ হোল। হাসপাতালের মেট গণি তার দলবল, যন্ত্রপাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

"নমস্কার। কেমন আছেন আজকাল।"

ক্ষীণদেহ পংগু দস্যুসর্দার ডানহাতটা ঈষৎ তুলে নামাল। আমার পরিচ্ছদের ওপর চোখ বুলিয়ে শান্ত এবং স্বাভাবিকভাবে বল্‌লে—"বাবু-চোর?"

"চুরি-টুরি পেরে উঠি নে। স্বদেশী ব'লে সিক্যুরিটী ক'রে রেখেছে। কেমন আছেন আপনি? খাওয়া-দাওয়া নিয়ে—"

"চাকরি-বাকরি ছিল না? বেকার?"

"না, নয় ধারা নয়। ভারতরক্ষা আইন, ১২৯, ২৬ ধারা।"

"যাক, এখনকার মত খাওয়াপরার নিশ্চিন্দি।"

হাসপাতালের 'ফাল্‌তু'গুলো সামনে দাঁড়িয়ে। বড় অপ্রস্তুত লাগছে। কী বলি? শেষে গণি বাঁচাল।

ভদ্দরলোক মানে কেরাণী আর ছোটলোক মানে চোরডাকাত।.. এই ত' জানো হালদার-সর্দার। দেশের জন্যে ভদ্দরলোকেও খুনডাকাতি করতে পারে, এত' দেখনি কখনো। স্বদেশীদের সংগে কথা বলতে জানবে কেমন ক'রে?"

অবজ্ঞার হাসিতে দুর্গার মুখ ভ'রে গেল। "হঁ্যা, হঁ্যা,—বাবু-ডাকাত না সোনার পাথরবাটি। যা যা বেরো।"

বেরুলাম গণির সংগে। "চলো গণি, ডাক্তারবাবুর কাছে যাব। কাল আবার এতগুলো রক্ত পড়ল। ক'দিন থাকি সিক্‌মানে।" (সিক্‌ম্যান—হাসপাতালের জেল-পরিভাষা)

গণি আমার অর্শ ও রক্তপাতের ধার দিয়েও গেল না। "সার, এই দুর্গা একটা মরদ। শক্ত কাজে ও কখনো দলের লোকদের পাঠাতো না। নিজে যেতো একা। কখনো হেরে আসে নি। ও লাখটাকার মালিক, জানেন সার?—তামাম অফিসারগুলোকে কিনতে পারে! কিন্তু পয়সা দিয়ে সুবিধে ও নেবে না। একটা অসুর ছিল, এইটুকু হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াতে পারে না। যাই

বলুন সার, ও মিথ্যে বলেনি। আপনাদেরও ত' দেখেছি সরকারের সংগে লড়তে অনশন-টনশন করেছেন—কিন্তু হাঁ, জবান রাখতে এই একটা লোককে দেখলাম।"

হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে সেল্-এ এলাম। স্নান-খাওয়া সেরে শুয়েছি। লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ফালি ফালি রোদ এসে পড়েছে মেঝের ওপর। শীতের রোদ, বড় মিষ্টি। দেয়ালের ওপিঠে পাতাঝরা নিমগাছের ডালগুলি একটু একটু দুলছে। বাইরে শালবন কাঁপিয়ে পদ্মার হাওয়া সরু সরু ডাক ছাড়ছে। ঘুমন্ত রক্ষ-পুরীর মতো থম্থমে নিরালা। নানান্ চিন্তা এসে এ সময়ে হাট বসায়। কতো মধুর স্মৃতি, কতো বুকভাঙা আঘাত, ছোটবড়, মিঠে-তেতো সবাই সমান আব্দারে আমার অংগনে এসে ঠাঁই গেড়ে বসে। আমি চুপ ক'রে দেখি, কখন হাসি, কখন কাঁদি। মাঝে মাঝে অতীতের পাশে আগামীও আসে তাদের ছলাকলা নিয়ে। আদর ক'রে বসাই। বলি—লক্ষীটী বসো, কিন্তু আর তোমাদের ছলায় ভুলবো না।

সাণ্টায়ানার কথা মনে পড়ে।—"জ্ঞানী হতে চাও ত' স্বপ্ন দেখবে, কিন্তু একচোখ মেলে। দুনিয়া থেকে দূরে থাকবে কিন্তু তার সংগে বিরোধ করবে না। পলাতকা মাধুরীকে বুকে তুলে নেবে, পলাতকা বেদনার জন্যে অশ্রু ফেলবে, কিন্তু ক্ষণেকের জন্যেও ভুলো না, এরা ক্ষণিকা, পলাতকা।"

বড় ভালো লাগে এ সময়টা। কাল হাসপাতালে যাবো। ছোট্টটো সেলটুকুর ওপর মায়া প'ড়ে গেছে।

সন্ধ্যা। ঢেকিচালির পথে বকুলতলায় ব'সে আছি। এমন ছুটির দিনটা মাটি হয়ে গেল। মান্নুর দেখা নেই। ফাঁসি-খাতায় বর্মীদের ভয় ভাংল না। দুর্গা ব'কে তাড়িয়ে দিল। গণিও মিষ্টি জুতো দিতে

ছাড়ে নি। কাল সেল্ ছেড়ে হাসপাতালে যেতে হবে। ভালো লাগছে না। যাই, সেল্-এ গিয়ে অন্ধকারে শুয়ে প'ড়ে থাকি।

উঠেছি,—একটা লোক এসে চুপি চুপি ছোট্টো এক টুকরো কাগজ হাতে গুঁজে দিল। আড়াল ক'রে তক্ষুণি প'ড়ে নিলাম। "সেলাম, ছয় খাতা, মান্নু।"

পত্রবাহক মদন শীল, আমাদের নাপিত, আরাকানি দলের গুণ্ডাসিক্যুরিটি। কোনদিন নাপিতের কাজ করেনি, কিন্তু ঐ শীল পদবীর ঠেলায় ওকে এখানে হাজামত করতে হয়। ক্ষৌরকর্মে না হলেও কথায় ও ধূর্তামিতে ওর জাতি-বৈশিষ্ট্য অব্যাহত। ক্ষুরের টানে দাড়ির আগে যখন চাম্ড়া উঠে আসে, পাঁচটা আঙুল ওর গালের ওপর ছুটে পড়তে চায়, তখন ও প্রবোধ দিয়ে বলে—"কিছু হবে না বাবু, ফিট্‌কিরি লাগিয়ে দিচ্ছি।" ফিট্‌কিরির জ্বালায় আর একবার দ্বিতীয় রিপু চঞ্চল হয়ে উঠলে বলে—"অস্ত্রটায় মোটে ধার নেই বাবু, শালা জমাদারকে ব'লে ব'লে হয়রাণ। যাই বাবু, একটা বিড়ি দেন। অস্ত্রে ধার না দিয়ে আর আপনার কাছে আসবো না।"

কোনদিন মদনকে স্বেচ্ছায় বিড়ি দিই নি, আজ মনের আগ্রহে দিলাম। কিন্তু ও নিল না,—কিছুতেই না। মিনতি ক'রে বল্লাম,—"মদন, ভালবাসার দেওয়া ঘুরিয়ে দিতে নেই।" "না বাবু, মাপ করবেন," ব'লে চ'লে গেল।

কোন অদৃশ্য নিয়তি আজ এমন ক'রে আমার পেছনে লেগেছে? গেলাম ছয় খাতায় মান্নুর কাছে। সে সেল্এ আটক, পায় বেড়ি।

"এ হাল কেন মান্নু?"

"শালা নতুন জেলার। ভালো আচেন ত' বাবু? নোমোস্কার।"

"নমস্কার। মাথা গরম কোর না।"

"না বাবু, গরম করলে চলে?"

"তোমার মাল আমি ঠিক ক'রে রেখেছি, কোন ভাবনা নেই।"

"কিসের মাল ?" বেশ অন্ধকার। মান্নুর মুখ দেখা যায় না।

"ঐ যে তোমার গিনি-চরস, ভিখনকে দিয়ে পাঠালে।"

অন্ধকারে মান্নুর মুখ দেখা যায় না। কয়েক মুহূর্ত যেন ভাবল, তারপর বলল, "ও"।—ছোট্টো একটা নিঃশ্বাস পড়ল, অন্ধকারে সাপের নিঃশ্বাসের মত।

"আচ্ছা, খুব সামলে রাখবেন। পারেন যদি কাল একবার আসবেন।" চ'লে আসছি, আবার ডাকল।

"আর বাবু, সেলাম। কখন কি বলেচি মনে কিচু রাখবেন না। ছোটলোক ত' আমরা।" ব'লে সিকের ফাঁক দিয়ে আমার হাতদুটো টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

পরদিনই ষ্ট্রাইক চুকে গেল। সরকার মিটিয়ে ফেলেছে। মান্নুর সংগে দেখা হোল না।

মদন শীল কাল বিড়িটা ফিরিয়ে দিল। ঘটনাটা কোথায় যেন কাঁটার মতো বিঁধে আছে। দুর্গার অপমান গায় লাগেনি। কিন্তু মদন আমার দৈন্য প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। ও জানে একটা জরুরি কাজ ও ক'রে দিয়েছে, আমি তার দাম ধরেছি একটা বিড়ি, আর তা দিয়ে ঋণের দায় এড়াতে চাই। যেন কাজটা আমার মৌরসি ওর বেলায় ব্যবসা। নিজের ছোট্টো কাজের গৌরবটুকু নিষ্কলংক রাখার মর্যাদা-বোধ মদনের আছে।

পাঁচ বছর আগের কথা। নিজ বাসায় নজরবন্দী ছিলাম। মনে

শান্তি ছিল না। উপার্জনহীন সমর্থ যুবক বালবিধবার মতো গলগ্রহ হয়ে আটক থাকি। মা স্নেহ-সান্ত্বনায় ডুবিয়ে রাখতেন, ছোটবোন মুক্তি আদর-আব্‌দারে ভুলিয়ে রাখতো। বিষণ্ণ দেখলেই একটা না একটা ছলা নিয়ে হাজির হোত সে। একদিন এমনি অবস্থায় আমার মাথাটা টেনে ফেল্‌ল ওর কোলে। "ওমা! বলত' রাঙাদার মাথায় কেন পাকা চুল পাই না? আজ বের করবই করবো। হ্যাঁ রাঙাদা বাজি—কত বাজি বল এক একটা পাকা চুলে?"

করলাম আত্মসমর্পণ। "নে চার চার আনা।"

"ঠিক ত'? মনে থাকে যেন। মাগো! কোথায় তুমি? সাক্ষী থেকো কী বলে। চার আনা ক'রে একটা।"

নরম নরম আঙুল চালিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পুট পুট ক'রে তুলে আনল আটটা। উঠল জয়ধ্বনি। ছুটে গিয়ে ধ'রে এনে দিল মাকে।

"নাগো মা! ও আমার চুল নয়, ও হাতে ক'রে এনেছিল ছকুলালের মাথা থেকে। আচ্ছা তুমিই বল আমি কি বুড়ো হয়েছি?"

মা উভয়-সংকটে পড়লেন। মেয়ে মিথ্যে বলছে না ঠিক,—কিন্তু ছেলের মাথায় আটটা পাকা চুল, তাই বা হয় কি ক'রে? এদিকে মুক্তি ফেটে পড়ল।—

"কি মিথ্যুক অসভ্য আর কিপ্‌টে। না, না, জচ্‌চুরি চলবে না। দিতেই হবে টাকা, দু'টাকা। মাগো, এমন কিপ্‌টে ছেলে তোমার, কি লজ্জা!"

অনেক ক্ষেপিয়ে দিলাম শেষে দুটো টাকা। এল শোন-পাপড়ি। বিজয়িনী মুক্তি বিতরণ করল সবাইকে।

পরদিন ব্যাগ খুলে দেখি দুটো টাকা কেমন ক'রে স্বস্থানে ফিরে

এসেছে। বেকার দাদার টাকা ছোটবোন ফিরিয়ে দিয়েছে চাতুরী ক'রে। নেই তোমার অধিকার ভালবাসবার। রোজগেরে দাদাদের মতো সোহাগ তুমি কেন করতে যাও বোনকে? তুমি নেবে কেবল কৃপার দান, দয়া ক'রে করা আব্দার।

কালও মদন দেখিয়ে দিল আমি নিঃস্ব, বেকার। দেবার মত কিছু নেই আমার। যা দিই ব'লে মনে করি তা আমার দান নয়, ওর পাওনা ও আদায় ক'রে নেয়। সম্পত্তি তারই যে কেড়ে কিম্বা ঠকিয়ে নিতে পারে। চোর-ডাকাতের কানুনে সেই মালিক।

ভালো লাগছে না। মানুই বা কেন আমার হাত ধ'রে অমন করল? রুক্ষ কড়া লোকটা, ওর মধ্যে এ অস্বাভাবিক কোমলতা কেন? না, ভাল লাগছে না। আবার কালই সকাল বেলা ছেড়ে যেতে হবে আমার একান্ত আশ্রয় এই সেল্টা।

তাল কেটে গেছে। নেশাও জমছে না। মনে হচ্ছে সব একঘেয়ে একটানা। কিছু নয়, ব'সে ব'সে নিজের মনে সোনার জাল বোনা। ও সাবানের ফেনার রঙীন ফানুসগুলি বারে বারে ভোলায়, ছুঁতে গেলেই ফেটে যায়। কোথায় বৈচিত্র্য? সেই বাতাসের চৌবাচ্চায় কই মাছের মতো সাঁতরান, ফাইল-বাঁধা জাঙিয়া-পরা কয়েদী, "বাবু একটা বিড়ি" কিম্বা "একটু পাতা", এরোপ্লেন দেখে চাতকের মতো চেয়ে থাকা, নাদির মহম্মদের জাপান আর সাহিত্য-সোপান, মকবুলের থালাবাজানো গান। সন্ধ্যায় কয়েদী লক্-আপের পর চারিদিকে সেই একটানা আলকাপের সুর,—

"ওগো শুন বচন বলি এখন কিসে হৈল টান গো
পাপাগুনে জলে গেল ফসল আদি ধান গো।"

আর সিক্যুরিটি নম্বরের দিকে বিনিয়ে বিনিয়ে নাকিস্বরে গান,—

"একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে.........."ইত্যাদি।

না, না। সমুদ্রভ্রমণে রোমাঞ্চ নেই। হোমারের কাব্যে আছে রোমান্স, বৈচিত্র্য, কিন্তু ইউলিসিস্-এর ভ্রমণ ছিল নিতান্ত বিস্বাদ, একঘেয়ে। বছরের পর বছর গেছে কেবল নীল আর লোণা। কোথায় সার্সি, সাইক্লপ্স্, সাইরেণ? বছরের পর বছর ছোট্টো নৌকাটীতে কয়টী সহযাত্রী নিয়ে লবণাক্ত নীল-নীলান্তে ভেসে বেড়ানো।

পরদিন বাদশাহি জেলের গতানুগতো ব্যতিক্রম ঘটল। আকাশে উড়োজাহাজ উড়ে গেল,—বোমা পড়ল না, জেলের গরাদ ভাংল না। একটা তুমুল বিপর্যয়ের মধ্যে ভাংল আমাদের খেলাঘর। নীলাভ নভতলে স্থির বায়ুভরে ডানা বিছিয়ে একটা চিল ভেসে যাচ্ছিল, হঠাৎ মেঘ জমল, ঝড় ছুটল, ঘুর্ণ্যাবর্তের মধ্যে চিলের পাখা ঝট্‌পটিয়ে উঠল, আকাশ ফেড়ে তার কাঁপা কাঁপা শীষের আওয়াজ নেমে এল।

প্রথম খবর,—ঢেকিচালির মাঠে প্রার্তভ্রমণ করতে গিয়ে দেখি ছোট গেট বন্ধ এবং মেট-জমাদার নিয়ে নতুন জেলার নিজে। শুনলাম, মান্নুর তিনহাত কৃষিক্ষেত খুঁড়ে কি কি গুপ্তধন বেরিয়েছে।

দ্বিতীয় খবর,—এর ঘণ্টা তিনেক পরে গোটা জেল কাঁপিয়ে এলার্মের ঘণ্টা বেজে উঠল। নম্বরে নম্বরে তালা পড়ল, লাঠি আর বন্দুক নিয়ে সিপাই-জমাদার ছুটল, কোথাও রক্তগংগা বইল। শুনলাম, কেস-টেবিলে ইউসুফ নতুন জেলারকে ছুরি মেরেছে। দুজনেই পরলোকের প্রতীক্ষায়। একজন হাসপাতালে—একজন ফাঁসিখাতায়।

তৃতীয় খবর,—সন্ধ্যায় কয়েদী লক্‌-আপের সময়ে আর একবার পাগ্‌লা ঘণ্টি বাজল। আবার সবাই তালাবন্ধ হলাম। ভিখন আর মামুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় পালিয়েছে।

চতুর্থ খবর,—খুঁজতে খুঁজতে মামুর তিনহাত ক্ষেতে এসে দেখা যায় একটা প্রকাণ্ড লাশ, কণ্ঠনালীতে একটু কাটা—এক ইঞ্চি, প্রয়োজনের একটুও বেশী নয়। ভিখনলাল।

পঞ্চম এবং শেষ খবর,—সন্ধ্যার পর কাপ্তানের পরোয়ানা এসেছে, কাল চালান যাবে হাওড়া জেলে।

পরদিন বিকেলবেলা। এইমাত্র সকলে কাপ্তানকে গেট পর্যন্ত বিদায় দিয়ে এল। দিনটা গুম হয়ে আছে। পরিবারে মৃত্যু হয়ে গেলে যেমন হয়, আমরা চলিফিরি ধীরে নীরবে,—যে চ'লে গেছে তার মৌন প্রচ্ছন্ন ব্যাপ্তির সংগে মিল রাখতে। হাসপাতালে পাশাপাশি বেড্‌-এ শুয়ে আছি আমি আর সুনীল। কী হারালাম আমরাই জানি। অথচ ঠিক হারাইও নি। আমাদের দুজনের মাঝখানে, আশপাশে, অন্তরের পরতে পরতে ছেয়ে আছে সে। তার ভাষায় শব্দ নেই, নিঃশব্দ কথায় ভ'রে আছে স্থান, নিঃশব্দে একাত্ম হয়ে গেছি সুনীল আর আমি তার মধ্যমতায়।

পশ্চিমে সোণালী রং-এর সূর্য ফুলভরা শিমুল গাছটার ওপর দাঁড়াল। একটু পরে জানালার জাল ভেদ ক'রে লাল আলোর ঝিল্‌মিল এসে পড়ল বিছানায়। শিমুলের আভায় সোণালী আলো লাল হয়ে উঠেছে। জেলারের বাড়ি থেকে মেয়েলী গলায় করুণ কান্না ভেসে আসছে। সামনেই ইউসুফের সেল্‌ উঁচু দেওয়ালে ঘেরা, শিমুল-রাঙা আলোরও ওখানে ঢুকবার অধিকার নেই। কী আসে যায় তার? দস্যুজীবনের নীতিতে সে ভ্রষ্ট নয়, বরং সিদ্ধকাম, দায়মুক্ত। মরণকে নিয়ে দিনের পর দিন যাদের ছিনিমিনি খেলা

কর্তব্য শেষ ক'রে নিশ্চিত মরণের প্রতীক্ষায় তারা হয় অচলপ্রতিষ্ঠ, স্থিতপ্রজ্ঞ।

"শহীদোঁকী টোলি নিক্‌লি।" মান্নু শুধু তার গানটী রেখে গেল। তার বুকের কাঁপন এখনো যেন লেগে আছে আমার আঙুলে। স্থির হয়েছে কি ওর সর্পিল নিঃশ্বাস? ওকি এতক্ষণে পেল ওর দুর্বৃত্তির সহচরদের? কোন অন্ধকার কন্দরে ব'সে চাপাস্বরে অবাঞ্ছিত পন্থায় অর্থাগমের ফিকির আঁটছে, না পালিয়ে ফিরছে অনুসৃত বন্যপশুর মতো? না, ওর জন্যেও ভয় নেই। যে নির্ভীক, স্থিরবুদ্ধি তার জন্যে কোন অবস্থায় ভয় নেই।

আর কাপ্তান। যাবার আগে এসেছিল। আমাদের দুজনকে এক সাথে বল্‌ল—"কি? মুখ শুক্‌নো কেন? দিন যায় আবার আসে। রইলে ত' সব।" ওর হাসিভরা মুখে এতটুকু হতাশার দাগ নেই। কিছু বলি নি আমরা, শুধু পরস্পরের মুখ চেয়েছিলুম। আমার নিজের কথা দেখি সুনীলের মুখের ওপর লেখা। তুমি ত' একা নও, তোমার হাত আছে, মাথা আছে। আমরা যে সবাই মিলেও একা!

"নিমেষবাবু!"

সুনীল একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। "আমার কি কোন আশাই নেই?"

চুপ করে ব'সে আছি। মিছে প্রবোধবাক্য। তার গভীর মর্মবেদনাকে সে মুক্ত করতে চায়। কষ্টে উচ্চারণ করল,—"কেন মোহিতবাবু আমাকে পথ দেখাল? কেন পথ দেখিয়ে ফেলে চ'লে গেল?"

"যায় নি ত'।"

দস্যুর চোখ ফেটে জলধারা নামল। "যায় নি? আমাকে মনে

রাখবে সে? আমাকে নেবে মোহিতবাবু?" উঠে ব'সে খপ ক'রে আমার হাত ধ'রে ফেল্‌ল। "আমাদের মানুষ ব'লে মনে করেন আপনারা?"

"দিন এলে দেখতে পাবেন।"

আবার চোখে প্লাবন নামল। হাত ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে—"নাঃ। মিছে আপনাদের ভুবি। নিজেই ত' মানুষ মনে করি না নিজেকে।"

"সব দোষের ক্ষমা আছে, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে সুনীলবাবু!"

না নেই। কী বুঝবেন আপনি, কী সাংঘাতিক পাপ, কী নোংরা, কী জঘন্য।"

চুপ ক'রে দেখছি। লাজারাস্‌-এর পুনর্জন্ম হচ্ছে। এই জন্ম-বেদনাকে সম্বর্ধনা করবার কোন ভাষা নেই, শুধু নিবিড় মমতা নিয়ে ব'সে থাকা।

"শুনবেন নিমেষবাবু? শুনবেন আমার কথা? কানে আঙুল দেবেন না?"

"শুনবো।"

অন্ধকার নেমে এসেছে। কয়েদী লক্‌-আপ হয়েছে। সামনে ঢেকিচালির মাঠ খালি। প্রথম দফায় পাহারার গুনতির হাঁক শোনা গেল। পদ্মার চরে একটা আঁধি উঠল, দিনের শেষ আঁধি। ছড়িয়ে দিয়ে গেল একরাশ বালি আর শালফুলের ঝাঁঝাল বিষাক্ত মদিরা।

পাতালের মানুষ

কালিঘাটে মন্দিরের একটু দক্ষিণে একটা পাঁচমিশেলি পাড়া। একটা গলির ছধারে সারি সারি খোলার ঘর। মেঝে ও দেয়াল মাটির। কোন কোনটার রোয়াকের একধারে চটের পর্দার আড়ালে রান্নার জায়গা। ঘর-দোর-রাস্তা নোংরায় ও ছর্গন্ধে ভর্তি। পাড়াটা সারাদিন নারীকণ্ঠের কানফাটা কল-কাকলিতে মুখরিত থাকে। সকালে সন্ধ্যায় জলের কলের কাছে মেয়েরা ভিড় ক'রে দাঁড়ায় যার যার কলসি বালতি নিয়ে। কলতলায়, রাস্তায় তাদের মুখ ছুটতে থাকে শালগঙ্গি পদ্মার হাওয়ার মতো। ছ-একটী পুরুষ নীরবে দাঁতনের কাঠি ঘষতে ঘষতে কলতলার আশেপাশে পায়চারি করে, ফাঁক পেলে ছটো কুলকুচি ক'রে মুখ ধুয়ে ফেলে। সন্ধ্যায় জল নেওয়ার পর্ব শেষ হলে কোন কোন মেয়ে কলতলায় স্নান ক'রে যায়। গামছা প'রে দ্রুত পায় বাসায় ফেরে, এলোচুলে ও ছহাতে যতটুকু সম্ভব নগ্নতা আবরণ ক'রে। আবরণের চেষ্টাটা অভ্যাস মাত্র, লজ্জা নয়। কারণ পাড়ার এই ক'টি দাঁতনওলা নিঃশব্দচারী লোককে এরা পুরুষ ব'লে মনে করে না,—তাদেরও দেখে দেখে চোখ ম'রে গেছে।

এই মেয়েপ্রধান পাড়াটা ঠিকে-ঝি, ঘুঁটেকুড়ুনি ও বাসনওয়ালিদের। কারো কারো ঘরবন্দী মরদ আছে, কারো কারো মরদ মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে যায়। নেংটা ছেলেপিলের কিচ্মিচি ও মেয়েলী ঝগড়ায় পাড়াটা সরগরম থাকে।

গলির মাঝখানে পশ্চিমদিকে একটু পড়ো জমি। কাঁচা মাটির ওপর দু-এক গাছা সবুজ ঘাস, মাঝ দিয়ে কোনোকুনি পায়চলা রাস্তা। জমির ও-মাথায় ভিখিরি-পল্লী। কানা, খোঁড়া, নুলো. বাটুল নানা রকমের অথর্ব মানুষের সংসার। কোথা থেকে সকালবেলা কতক-গুলো সুস্থ সমর্থ লোক আসে, ঠেলাগাড়ি ক'রে মন্দিরের আশেপাশে, স্নানের ঘাটে রেখে আসে এদের। সন্ধ্যের পর আবার ফিরিয়ে আনে —পয়সার ভাগ নিয়ে সমর্থ ও অথর্ব লোকে ঝগড়া লাগে। তখন এখান দিয়ে হেঁটে গেলে বোঝা যায় যে এই অচল মাংসপিণ্ডগুলির বোধবুদ্ধি আছে—এরাও নড়েচড়ে, কথা কয়, ঘর-সংসার করে পর্যন্ত।

এর পরেই গংগা। বস্তির দক্ষিণ প্রান্তে বড় রাস্তা। রাস্তার উত্তর পারে মেয়ে-পাড়া আর ভিখিরি-পাড়ার লাগ গুটিকয় ছোট ছোট সেকেলে ধরণের পাকা বাড়ি গংগার পার পর্যন্ত। এসব বাড়িতেও মেয়েছেলেই বেশী, তবে ততো হৈ চৈ নেই। বেশ শান্ত পাড়া। শুধু রাতে কোন কোন বাড়ি থেকে কখন কখন হারমনিয়মের আওয়াজের সংগে মেয়েলী গান শোনা যায়, ঘুঙুরের শব্দও যে কদাচিত না আসে তা নয়।

এদের বলে হাপ্-গেরস্ত ঘর। কলকাতার খ্যাতনাম্নী বাড়িউলিদের কেউ কেউ কখনো কখনো ধর্মকর্ম নিয়ে সদ্ভাবে জীবনযাপন করতে চান। মেয়েদের মধ্যেও অনেকে বারবৃত্তি পছন্দ করে না, একচারিনী হয়ে থাকতে চায়। যে সব পুরুষসিংহের পৌরুষ সংসারের ছোট্টো পাত্রে ধরে না, অথচ বারজীবিনীর সংগ যাঁদের রুচিতে বাধে তাঁরা এক

একটী সংগিনী বেছে নিয়ে 'মাসী'র ঘর ভাড়া নিয়ে তাঁর আশ্রয়ে রাখেন। এরাই হাপ্-গেরস্ত, ফুল-গেরস্তালির ফাঁকে-ফুরসুতে হাপ্-গেরস্তালি দেখাশুনো ক'রে যান। যাঁদের ফুল-গেরস্তালির বালাই নেই তাঁরা পাকাপাকি বাস করেন। ভোরবেলা মাসীরা মেয়ে-বৌ নিয়ে নিয়মিত গংগা নেয়ে আসেন। কপালে চন্দনের চিত্তির চুলের ওপর ভিজে গামছা, হাতে ভিজে শাড়ি আর চক্‌চকে মাজা পেতলের ঘটিতে গংগাজল। পরণে গরদের শাড়ী আর চুলের ফাঁকে খুব চওড়া লম্বা ক'রে সীঁদুরের টান।

মাসী ও মেয়ে-বৌরা ফিরতি পথে মন্দিরে প্রণাম দিয়ে আসেন। নানান্ রকমের মানত হয়। বস্তির ঠিকে-ঝি এসে প্রসাদী পাঁঠার মাংস নিয়ে যায়।

পাড়াটা রীতিমত ভদ্র এবং পুণ্যস্থ। বাইরে থেকে দু'চার দিনের তরে এসে পুণ্যার্থীরা মা, দিদিমা, পরিবার নিয়ে এখানে ওঠেন। তীর্থ ক'রে, যোগে গংগায় ডুব দিয়ে কালি-মার কাছে প্রতিশ্রুতি পালন ক'রে চ'লে যান। পথে দু'দিনের জন্যে মাসীর ঘর ভাড়া নিলে তিনি অস্থায়ী সংসারের যোগাড়যন্ত্র গোছগাছ সব ঠিক ক'রে দেন, কোন অসুবিধে হয় না।

এত পবিত্র সংসারী আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও মাঝে মাঝে দু' একটী মেয়ের মতিগতি চঞ্চল হয়ে ওঠে। হয়ত' কর্তা শহর ছেড়ে বাইরে গেছেন, দু'একরাত আসচেন না। মাসী চোখ টিপে দেন, অর্থাৎ একজনের ভরসায় থাকতে নেই, মন আছে যেতে কতক্ষণ? হাতের পাঁচ ছাড়বি নে। তবে বেশী হৈ চৈ হয় না। মেয়ে গা ধুয়ে ভালো শাড়ী-গয়না পরে, চুলে ভিজে গামছা দিয়ে পাতা কাটে, কপালে বড় ক'রে টিপপোকার টিপ দেয়। দুটী-একটী অতিথি আসেন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভরসা। ঝি-র হাতে বিলিতি বোতলও আসে

হয়ত' বা। মেয়ে হারমোনিয়ম নিয়ে বসে, তাতে অতিথির সখ না মিটলে পায় ঘুঙুর বেঁধে দাঁড়ায়। কিন্তু এর চেয়ে বেশী হৈ-হল্লা হয় না। করতে গেলে মাসী রাস টানেন, কড়া হন। মাসীরা পাড়ার বদ্‌নাম হতে দেন না।

এমনি এক ডাকসাইটে মাসীর ঘরে একদিন বজ্রপাত হোল। মাসী পথে বসলেন। পাড়ার নাম ডুবল।

১৯৩৩ সাল। বাংলায় সেটা এণ্ডারসনী আমল। টেগার্ট সাহেবের শাসনদণ্ড হাতে নিয়েছেন বাংলার ছোটলাট। হোয়াইট হল, দিল্লী ও কোল্‌কাতার সমবেত তৎপরতায় বাংলা থেকে সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদ করবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে এসেছে। ইস্কুলের মাষ্টারদের দিয়ে গোয়েন্দাগিরি ও প্রচার-কার্য করানো হচ্ছে। সহরের পল্লীতে, গ্রামের ইউনিয়নে রক্ষীবাহিনী গঠিত হচ্ছে। সংবাদপত্রে, সভায়, সাহিত্যে, সিনেমায় সর্বত্র সর্বতোমুখী সংগ্রামের অভিযান স্থরু হয়েছে। এই বেড়াজালের মধ্যে ঘিরে আইবি পুলিশ রক্তবীজের গুষ্টির যে ক'টা অবশিষ্ট আছে তাদের একে একে ছেঁকে বের করছে।

মোহিত, আমাদের পূর্বোক্ত কাপ্তান তখনো কোন রকমে গা ঢাকা দিয়ে আছে। মাঝে ম্যাঝে ও এসে এখানে মাথা গোঁজে রাইকমলের বাসায়। বাসাটা হাপ্‌-গেরস্ত-পাড়ার এক মাথায়। পশ্চিমে গুটিকয়েক ছোট ছোট দোকান,—পান, ফুল, খেলনা, চন্দন-কাঁটা নানান্‌ রকমের। তার পরে রাস্তা, রাস্তার পরে গংগা। পাছদুয়ার দিয়ে বেরুলেই বস্তি, সদরের সামনে বড় রাস্তা। পুবদিকে চাতালের পরে আর এক

পরিবারের ঘর, এটার মতই দোতলা। মাঝে জানালা খুললে হাত পনের তফাত—এবাড়ি ওবাড়ি জোরে কথা বলা যায়।

মোহিত তখন এম-এ কেলাসের পড়া ফেলে ডুব মেরেছে। কমলদা,—রাইকমল সামান্য চাকরি-বাকরি করেন। সংসারে তার কেউ নেই, কাদুমাসী আর হাপ্‌·গিন্নী পদ্ম ছাড়া। এ সংসারে মোহিতের নাম আনন্দ। সত্যিই সে আসে আনন্দের একটা ঝর্‌ঝরে ফোয়ারার মতো। পদ্মকে ডাকে বৌদি, কাদুমাসীকে মাসীমা, শেষের অক্ষরটার দৈর্ঘ্য ও ওজন বাড়িয়ে। মাসী ও হাপ্‌-গিন্নীদের কপালে এসব ডাক জোটে না। মোহিত এলে মন্দির থেকে ভোগের পাঁঠা আসে। হাত পেতে মোহিত মাসীমার হাতের রান্না মাংস চাখতে বসে, তারিফ করে. ঘাড় বুঝে বলে অনেকদিন পরে মায়ের রান্নার স্বাদ পেলাম। বৌদিকে কমলিনী সাহিত্য মন্দিরের উপন্যাস কিনে দেয়। দুপুরবেলা পাছদুয়ারে কুলগাছ-তলায় ব'সে পদ্মর বাপের বাড়ির গল্প শোনে। ছেলেবেলার গল্প, এখন স্বপ্নের মতো। বৌদির গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে গেলে নিজে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

কাদুমাসী এ বাড়ির আর পাশের বাড়ির মালিক। পড়শীরা, বিশেষ ক'রে পাশের বাড়ির গৃহিণী ঝরণা প্রায়ই বেড়াতে আসে পদ্মর বাড়ি। ঝরণার কর্তা পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের বড় চাকুরে। মামুলি ঘর-গিরস্তালি আছে, এটা ওপরি। মাঝে মাঝে আসেন, সবদিন থাকেন না। কোন কোন দিন ইয়ার-বন্ধু নিয়ে আসেন—অবশ্যি বাছা বাছা দু-একটা, ঝরণা গান শোনায়। কর্তা ওকে সোনাদানা দিয়ে মুড়ে রেখেছেন। বড়লোকের গিন্নী ব'লে এবং আসলের ওপর টেক্কা দিয়ে আছে ব'লে ওর একটু গরম আছে। নতুন শাড়ি বা গয়নাগাটি পেলে পরদিন এ বাড়ি এসে দেখিয়ে যায়। আনন্দ ঘরে থাকলে পদ্ম হার মানে না। তার

শাড়ি-গয়না না থাকতে পারে, কিন্তু এমন ঠাকুরপো ত’ ঝরণার নেই।

ঝরণার মুখ সত্যিই শুকিয়ে যায়। কর্তার ইয়ার-বন্ধুগুলো আর এক রকমের, পদ্মর ঠাকুরপোর মতো নয়। অমন একটা দেওর পেলে বেশ হোত। কিন্তু তা হয় না, কোনদিন হবে না। রাইকমলের বউ নেই, পদ্মই সব। ঝরণার কর্তার বউ আছে। কর্তাকে সে ছিনিয়ে নিতে পারে, কর্তার ভাইরা থাকবে আসল বউর ঠাকুরপো হয়ে। কোনদিন তার ছায়াও মাড়াবে না।

কর্তার মনও আজ আছে, কাল যে থাকবে তার নিশ্চিতি কি? মাসের অর্ধেক দিন তিনি আসেনও না। দিন একরকম কাটে—গংগার ঘাট, পদ্মর বাড়ি, মায়ের মন্দির, আরতি, ইত্যাদি ক’রে। কিন্তু রাত? এক একটা রাত আসে কেমন যেন নেশায় ছোপানো, আকাশের চাঁদিনী জানলা দিয়ে চুপিসারে ঘরে ঢোকে, নিশুতি নীরবতার মধ্যে গংগার কুলু কুলু আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। এমন রাতে একা থাকা যায় না। আকাশের জ্যোছনা চোর, নদীর কুলুধ্বনি চোর, ঝরণাও চোর হয়। কাদুমাসী ইসারায় সম্মতি দেন, বস্তির ঝি দৌত্য করতে বেরোয়, অতিথি আসে, রাত আর নেশা একসংগে কাটে।

দিনকয়েক হন্তে কুকুরের মতো এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে একদিন খুব ভোরে মোহিত এসে এ বাড়িতে হানা দিল। পদ্ম আহ্লাদে আটখানা। রাইকমল বাড়ি নেই, দিনটা আনন্দ ঠাকুরপোকে নিয়ে মহা আনন্দে কাটবে। স্নান ক’রে ফিরতি পথে মাসীমা নিজ হাতে বাজার ক’রে নিয়ে এলেন,—দুজনে চল্‌ল রান্নার প্রতিযোগীতা। খাইয়ে দাইয়ে মাসীমা বল্‌লেন—“এবার আর ছাড়চি নে আনন্দ! আজই দুপুরে তোমার মুখে ভাগবত শুনবো। মোহিতের জবার ঠোঁটের

গোড়ায়,—"সে কথা ভুলতে পারি নি বলেই ত' আসা, নইলে আমার কি এখন মরবার ফুরসৎ আছে মাসীমা ?"

বিকেলবেলা পদ্ম চা তৈরী করল। ঝরণাও এল বেড়াতে। ওর কর্তা মফস্বলে গেছেন, দুদিন যাবত বাড়ি নেই। আজ সামনাসামনি মোহিত ঝরণাকে ভালো ক'রে দেখল প্রথম। ওর চেয়ে বছর তিন চারেক বড়, পদ্মর সমবয়সী। কালো সুশ্রী মেয়েটা। পদ্ম চা তৈরি ক'রে খাওয়াল মোহিতকে। ঝরণার বড় সাধ হচ্ছিল ও-ও মোহিতকে কিছু একটু ক'রে খাওয়ায়, মোহিত হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে এমনি ক'রে তুলে নেয়। একবার ভাবল লজ্জার মাথা খেয়ে বলে পদ্মকে। পদ্ম চালাক মেয়ে, বুঝল একটু একটু। কিন্তু এতো বড় সম্পত্তিতে কাউকে ভাগ বসাতে দিতে সে রাজি নয়।

আনন্দও বুঝতে পারছিল। খুব মমতা লাগছিল তার। বহু অতৃপ্ত কামনা মেয়েটীর মুখে চোখে, ওর শ্রীকে ঢেকে রেখেছে কিন্তু সারল্যকে নয়। ও বোকা নয়, কিন্তু দেখলে মনে হয় যে এই পতিত জীবনের পথঘাট সব চেনে না। মোহিত ভাবল কাল একবার যাবে ওর কাছে, খাবে ওর হাতে। কিন্তু কী ব'লে ডাকা যায় ? আচ্ছা, ঠিক হয়েছে,— ছোড়দি'।

অন্ধকার হতে হতে মোহিত পথে বেরুল। গা-ঢাকা লোকদের কাজকর্মের এই সময়। ঘুরে টুরে এসে পদ্মর কাছে বকুনি শুনতে শুনতে খেতে বসল। অনেক রাত হয়েছে। খেতে খেতে একবার জিগেশ করল,—"ও বাড়ির বৌটী কেমন বৌদি ?" পদ্ম চালাক মেয়ে। মুখ ঝামটা দিয়ে বললে—"ও নচ্ছার মেয়ে, যেও না ব'লে দিচ্ছি ওদের বাড়ি।"

মোহিত বড় ক্লান্ত। শুতে না শুতে চোখ জড়িয়ে এল। ঘুম আসতে আসতে ঝরণার ছবি একবার মাথায় ঘুরে গেল। না না,

যাবো একবার। আহা বেচারী! ঠিক হয়েছে, ছোড়্দি। বেশ মিষ্টি ডাক।

একটা গোলমাল শুনে মোহিতের ঘুম ভেঙে গেল। মাসীমার গলা না? সদর রাস্তা আর পূব দিকের বাড়িটা থেকে অনেকগুলো লোকের গলার আওয়াজ আসছে। কড়া গলায় পুরুষের কথা আর তার সমান পর্দায় মাসীমার কথা। হঠাৎ মাসীমা নিজ মূর্তি ধরেছেন কেন? ব্যাপার কি? জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল মোহিত। যা দেখল তাতে বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। পুলিশ, তার যম। আর কথাটি নয়। মণিব্যাগটা পকেটে পুরে, জামাটা চড়িয়ে টুক ক'রে নেমে পড়ল মোহিত। পাছদুয়ার দিয়ে যাওয়া চলবে না, কুলগাছটার আড়ালে দেয়াল টপ্‌কে সোজা গংগার পার। উঃ! বড্ডো বেলা হয়ে গেছে, রোদ চ'ড়ে গেছে। অমন মোষের মতো ঘুমোনো ঠিক হয় নি।

মোহিত দেয়াল থেকে পা ঝুলিয়ে দিল। পুলিশ নেই এদিকে। লোকজনও নেই। টুক্ ক'রে নেমে পড়ল, শব্দ হোল একটু! বস্তির দিক থেকে একটা ছোঁড়া চেঁচিয়ে উঠল—"হেই রে-রে-রে।" অমনি চার দিক থেকে "ধর ধর, হেই যায়, হেই।" মোহিত নিঃশ্বাস ফেল্‌ল একেবারে টালিগঞ্জ থানার হাজতে ব'সে।

তার পরের ঘটনা সব মামুলি। দারোগা বল্‌লেন—"আনন্দ গোস্বামী! বেড়ে নাম। গোসাইঠাকুর এখানে আনন্দ করুন কিছুদিন। তা গোসাইজী এ রাস্তার পথিক হয়েছেন কতদিন?"

আসামী চুপ ক'রে আছে দেখে দারোগা স্বর বদ্‌লালেন—"শালা যা যা করেছিস খুলে বল্‌।"

"আপনিই বলুন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"দরওয়াজা।"

"হুজুর!"

"বেত লাগাও।"

দারোগার মায়াদয়া আছে। এক ঘা পড়তেই বল্‌লেন "রোকো। এইবার বুঝতে পারছিস?"

"না।"

এই প্রহসন কিছুক্ষণ চল্‌ল। তারপর এল বস্তির মেয়ে ঝরণাদের ঝি দামিনী। দারোগার সামনে মোহিতকে সনাক্ত করল—হাঁ এই বাবু। তারপর কাদুমাসী। এতক্ষণ তিনি দুর্ধর্ষ প্রতাপে লড়ছিলেন। কিন্তু এই থানা পর্যন্ত টানাটানি আর আনন্দর দুর্দশা দেখে তিনি ভেঙে পড়লেন। বল্‌লেন—"দারোগাবাবু, আমাদের রেহাই দিন। কি চান, কতো চান বলুন, নিন আমাদের সর্বস্ব।" দারোগা বল্‌লেন,—"মাগীর এতক্ষণে হুঁস হোল। যা ঐ দিক গিয়ে বোস্‌।"

কাদুমাসীর চোখ দিয়ে জল পড়ল। এ দৃশ্য মোহিত কোনদিন দেখে নি। চিরকালের নির্ভীক এবং উদ্ধত মাসীমাকে এই নিষ্ঠুর লাঞ্ছনার পীড়নে বড় অসহায় লাগছে। মোহিত বল্‌ল—"যা করবার আমি করেছি, ওঁদের অনর্থক হয়রাণ করছেন কেন?" এর উত্তরে দারোগা বিশ্রী ভাষায় যা তামাসা করলেন তাতে মোহিত মুখ তুলে মাসীমার দিকে তাকাতে পারল না। তারপর—"এত টাকা তোর ব্যাগে এল কোত্থেকে? কে কে সংগে ছিল? কেমন ক'রে মারলি? হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস ত' টাকা এল কোত্থেকে শালা নবাবপুত্তুর?"

ব্যাপারটা বোঝা গেল পরদিন দুপুরে। সিপাইকে ব'লে ক'য়ে

বাংলা কাগজটা নিলে। একটা খবর চোখে পড়ল। "গতকল্য রাত্রে কলিকাতায় এক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কালিঘাটে...... রোডে একটী গৃহে ঝরণাবালা দাসী নাম্নী একটী যুবতী স্ত্রীলোককে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া এবং তাহার অলংকার ও বহু অর্থ লইয়া দুর্বৃত্তেরা অন্তর্হিত হয়। এই সম্পর্কে একটী ভদ্রবেশী যুবক পার্শ্ববর্তী গৃহ হইতে গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহার নিকট হইতে নগদ পাঁচশত টাকা উদ্ধার হয়। বাড়ীর ঝি এজাহারে বলে যে একজন প্রণয়ী স্ত্রীলোকটীর কাছে রাত্রিবাস করিতে আসিয়াছিল। তাহাকে সে পূর্বেও বারকয়েক আসিতে দেখিয়াছে। ধৃত যুবককে সেই ব্যক্তি বলিয়া ঝি সনাক্ত করিয়াছে। যুবকের নাম আনন্দ গোস্বামী।"

কতো সাক্ষীসাবুদের সামনে যে দাঁড়াতে হোল মোহিতকে, কতো জেরাজেরিতে বিধ্বস্ত হোতে হোল তাকে এবং সাক্ষীসাবুদদেরও তার হিসেব নেই। ফলে দু-তিন দিনেই মুখোস খুলে পড়ল। দারোগা মুচ্‌কি হেসে বল্‌লেন—"এদ্দিনে শালার আমার ভোল নামল'— এইবেরে বেরুবে সব।" পরদিন আবার কাগজে বেরুল—"জানা গিয়াছে.........রোডের হত্যার ব্যাপারে যে যুবকটী গ্রেপ্তার হইয়াছে আনন্দ গোস্বামী তার ছদ্মনাম। তার আসল নাম মোহিত সান্যাল। যুবকটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কয়েকমাস যাবত সে নিরুদ্দেশ হয়, পরিবারে খোঁজ করিলে তারা বলে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডের একটী গূঢ় রহস্য এই যে স্ত্রীলোকটীর দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না, ময়না তদন্তে কোন বিষপ্রয়োগের লক্ষণও ধরা পড়ে নাই। বিশেষজ্ঞমতে এই নৃশংস হত্যার পিছনে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কার্যকলাপ আছে।"

তখন বক্সা বন্দীশিবিরে ব'সে এ খবরটা প'ড়ে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। হায় হায়, এ কি দুর্দশা! সত্যিই কি মোহিত টাকার

টানাটানিতে প'ড়ে ঐখানে ডাকাতি করতে গিয়েছিল নাকি? এদিকে কিন্তু এ খবরটা কাগজে বেরিয়ে মোহিতের ভালই হোল। পরদিনই আই-বি পুলিশের একজন চাঁই এলেন,—"হ্যাঁই যে মোহিতবাবু, গুড্ মর্ণিং। কী দুর্ভোগ আপনার। একটা খবরও ত' দিতে পারতেন আমাদের। চলুন আমাদের উদিক। নেয়ে খেয়ে সুস্থ হন, তারপর হবে সব কথাবার্তা।" তখনি গাড়ি ক'রে মোহিতকে নিয়ে গেলেন স্বনামধন্য দালান্দা হাউসে। পথে বল্‌লেন—"ছি-ছি, এই ক্যালকাটা পুলিশগুলো মানুষ নয়। এদের পাল্লায় প'ড়ে কত কষ্টই না জানি পেয়েছেন। তারপর কি রকম একটা বিশ্রী কেসে ফেলবার চেষ্টা। কিচ্ছু না দেখুন, মেক্ এ ক্লীন ব্রেষ্ট্। দু-চারটে নাম ঠিকানা ব'লে একটা ষ্টেট্‌মেণ্ট দিয়ে চ'লে যান, বিলেত থেকে আই-সি-এস হয়ে আসুন। আপনাদের মতো দেশের এক একটা জুয়েল···"ইত্যাদি।

দালান্দা হাউস থেকে লর্ড সিংহ রোড আণ্ডার-ট্রায়েল এর 'ধোলাই', শেষে খালাস ও বংগীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক, এসব কথা এখানে অবান্তর। দুঃখমোচন না হলেও মোহিতের কলংকমোচন হোল। সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু মনে পড়তো ঝরণার কথা। দেহের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও ভুলতে পারে নি না-ডাকা ছোড়্‌দির মুখ। আহা, বুঝতো না এ পথের আঁতঘাঁত। ডাকা হোল না, খাওয়া হোল না ওর হাতে। কে মারলে ওকে এমন ক'রে? ছি, ছি!

এ সব শুনেছি মোহিতের কাছে ১৯৩৮ সালে খালাস হবার পর। এক এক সময়ে আমারও মনে হয়েছে আহা মেয়েটা!

আজ রাত্রে পাঁচ বছর পরে বাদশাহী জেলের হাসপাতালে ব'সে জানলাম ওর হত্যাকারী সুনীল।

তখন সুনীলেরও অবস্থা হচ্ছে কুকুরের মতো। কোল্‌কাতার অতো বড় দল তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেছে গুণ্ডা আইন ও টেগার্ট সাহেবের ঠেলায়। কেউ পালিয়েছে, কেউ এক্‌স্‌টার্ণ হয়েছে, কেউ ধরা পড়েছে। নোট-জাল, মটর ডাকাতি, ইত্যাদি বড় বড় কারবার আর নেই। পুলিশের বড় বড় চাঁইরা দলের কাছ থেকে মাসহারা পেতেন, কেউ কখন এদিক ওদিক করলে তার চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবার পাকা বিলি-ব্যবস্থা ছিল। বেপরোয়া জীবন, অজস্র টাকা আর মদ মাংস মেয়েমানুষ— সে এক অস্থির স্রোতের মতো। দৃষ্টি কোথাও বাধা পেতো না, ভাববার বুঝবার অবসর ছিল না। সে সব দিন গেছে। উচ্ছৃংখল অশান্ত জীবনের স্বাদ আর নেই। শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টা যে এতো কঠিন হ'তে পারে তা আগে কে জানতো? আর জীবনের মধ্যে যে এতো গ্লানি তাই বা কে জানতো?

কিন্তু বাঁচতেই হবে। শুধু বাঁচবার জন্যে নয়, আরো যে জন্যে বাঁচতে হবে সে পরে বলবো। এ যেন বদ্ধ ঘোলা জলে ডুবে মরতে মরতে হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে থাকা। যতো হাত-পা ছুঁড়ছে ততো জল ঘুলিয়ে উঠছে, ঘোলা জল নাক মুখ দিয়ে দেহে ঢুকছে, তবু হাত-পা ছোঁড়ার বিরাম নেই, কারণ বাঁচতে হবে। টাকা চাই। এ কারবারের পুঁজি-পাথেয় সামান্য নয়—প্রচুর টাকা চাই।

হয়তো বেঁচে থাকা সম্ভব হোত না। মুষ্টিমেয় কয়টী কাঁচাহাত অনুচর নিয়ে, আকণ্ঠ ঘোলা জল গিলে শ্বাসরোধ হয়ে হয়তো তাকে মরতেই হোত শেষ অবধি। সে বেঁচে গেল সন্ত্রাসপ্রয়াসের দৌলতে।

লণ্ডন, দিল্লী ও কল্‌কাতা থেকে বিজ্ঞাপিত হোল বাংলার দুষ্ট ব্যাধি সন্ত্রাসবাদ আরোগ্য না হ'তে আর কিছু নয়। অর্থের জন্যে খুন ডাকাতি গুণ্ডামি কোথায় না আছে?—ওসব এখন থাক। পুলিশের খেয়াল অন্য দিকে,—সেই ফাঁকে সুনীল টিকে ছিল।

মেয়েমানুষ খুন ক'রে তার দেহবিক্রীর টাকা আর গয়নাগাটি নিয়ে পালানো—এই তখন সুনীলের কারবার। এই কারবারে যাদের সংগে লড়তে হয় তারা লম্পটের বিশ্বাসঘাতকতার কাছে সম্পূর্ণ অসহায়—যতই তাদের অর্থ থাকুক এবং যতই তারা সাবধান হোক না কেন। সেদিন বিকেলবেলা যখন ঝরণা তৃষিত চোখে দেখছিল যে পদ্মর হাত থেকে তার ঠাকুরপো চা-এর কাপ তুলে নিলে তখন, ঠিক সেই সময়ে খুব কাছেই রচনা হচ্ছিল তার মারণচক্র। তার মৃত্যুটা অবশ্য গৌণ, চক্রের একটা সামান্য আংগিক। ষড়যন্ত্রটা অর্থের জন্যে।

বিকেলবেলা বস্তিতে দামিনীর সংগে সুনীলের কথা। দামিনী বল্‌লে—"তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে নি কো। সব ঠিক আছে।"

"সিন্দুকের চাবি?"

"ও তোমাকে গুছিয়ে নিতে হবে। বোতল আমি তৈরী ক'রে রেখেছি। এক গেলাস খেলেই মেয়ে কাত্‌ হয়ে পড়বে।"

সুনীল দামিনীর গালে একটা টোকা দিলে। "পাগ্‌লি। চাবি কখনো ওর কাছে থাকে? নিশ্চই কর্তাবাবু সংগে নিয়ে গেছে।"

"তা'-লে সিন্দুকটা ভাংতে পারবে নি? কি রকম মরদ গো?"

"সে হবে খন। সদরের তালাটা কিন্তু ভাই সময়মতো খুলে দিও। নইলে জাতিকলে ইঁদুর-মরা মরবো। এবার প্রাণটা একেবারে তোমার হাতে।"

দামিনী দামিনীর মতো কটাক্ষ হেনে বল্‌লে—"বেশ ত' থাক্ না। আর নাই বা দিলুম। তারপর সুর বদ্‌লে, "মুখে ত' ভারি মিষ্টি।

এদিকে এদ্দিন বলছি একটা বিছে হার, গলায় পরতে পেলুম নি। ছেলেটাকে ইস্কুলে দেবো, মেয়েটাকে ভাল ঘরে পার করবো তার পওসা নেই।”

ইংগিত বুঝে সুনীল সংগে সংগে একশটী টাকার কর্‌করে নোট বের ক'রে দিল। এ সব কারবারে দরদস্তুর চলে না। “তা হ'লে ঠিক রাত দশটা। চলি। উঠত উঠতে একটা অবান্তর কথা মনে পড়ল।

“আচ্ছা, মেয়েটা কেমন?”

“বোলো নি। এক্কেবারে বোকা।”

রাত দশটায় সুনীল মোটর হাঁকিয়ে হাজির হোল। দামিনী তাকে ওপরে নিয়ে গেল। কাতুমাসী তাকে আপাদমস্তক দেখলেন। দামিনী ফস্ করে বল্‌লে “চিনতে পারছ নি মাসী? হাই যে সাম-নগরের ছোটবাবু, কর্তাবাবুর সংগে একদিন আইছ্যাল।” সুনীল নমস্কার ক'রে কিছু দক্ষিণা তুলে দিলে। মাসী জিগেস করলেন অতিথি থাকবে কতক্ষণ। সুনীল বল্‌লে,—“তা' একটু রাত হবে বৈ কি মাসী—বৌঠানের সংগে একটু গপ্‌প-টপ্‌প ক'রে—।” মাসী বেরিয়ে গিয়ে সদর দরজায় তালা আঁটলেন, চাবি আঁচলে রইল। দামিনীকে বল্‌লেন—আমি পদ্মর চিলকোঠায় শুলুম। বাবু যেতে খুঁজলে আমায় ডেকে দিবি।”

সুনীলের প্রথম সম্বোধন,—“কিগো বৌঠান, চিনতে পারো?” ঝরণার তখনো মনে পড়ছে পদ্মর ঠাকুরপোর কথা। সে হকচকিয়ে গেল। সুনীলকে সে চেনে না। সন্দেহ হোল। সাবধানতার ত্রুটী করল না। সুনীলকে আগে না খাইয়ে ওর মদ ও খেল না। খেল-ও সামান্য। কিন্তু দেহকে কতক্ষণ আর নিজের বশে রাখা যায়। যখন স্নায়ু ও পেশীগুলি শিথিল হয়ে এসেছে সুনীল একখানি পাতলা

সিল্কের রুমাল বের ক'রে ওর মুখে পুরে দিলে। ফরসেপ্‌স্‌ দিয়ে হাঁ করিয়ে একটা বাঁকা ক্যাথিটার দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে রুমাল গলার মধ্যে যতদূর যায়। ঝরণার কালো চোখদুটো ভোমরার মত খানিক ফর্‌ফর্‌ ক'রে থেমে গেল।

সিন্দুক যদি বা অনেক চেষ্টায় খোলা গেল, ভেতরে একদম ফাঁকা। সুনীলের মনে হোল ঘরটা দুলছে। ঝরণার হাতটা গলাটা পর্যন্ত খালি। অতিথি বেশী রাত পর্যন্ত থাকবে শুনে মাসীর কাছে গায়ের গয়না খুলে রেখে দিয়েছে। সিন্দুকের ভেতরটা হাঁ ক'রে ব্যাংগ করছে আততায়ীকে।

কি মনে ক'রে হঠাৎ সুনীল বিছানার নীচে পুরু তোষকটায় ছুরি চালিয়ে দিলে। বোঝা গেল ওখানেই মাল আছে। তারপর সব গুছিয়ে নিয়ে সদরে টোকা দিলে। দামিনী তালা খুলে দিল।

পরদিন ভোরে দামিনীর ফাঁড়াটা কাটল মোহিতের কল্যাণে। যখন পুলিশের হুঁস হোল তখন দামিনী তাদের আওতার বাইরে— অনেক অনেক দূরে। সুনীলও তখন মাসকয়েকের মতো নিশ্চিন্ত।

সুনীল থামল। জানি না দম নেবার জন্যে না বিচারের প্রতীক্ষায়। জানি না এই উগ্র বিষ উদ্‌গীরণ ক'রে ও সুস্থ বোধ করছে না যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে আছে। হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় ওর মুখ ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছে না। আমার সর্বাংগ দারুণ গ্লানিতে পাক দিয়ে উঠছে। ব্যথা-বেদনায় রাঙা ছবিটা যেন সহসা মসীময় হয়ে উঠল,—মোহিত, মার, ইউসুফের সুন্দর পরিবেশটা রূঢ় আঘাতে খান খান হয়ে গেল।

পিছনে কয়েদীর দল রোগযন্ত্রণায় কাত্‌রাতে সুরু করেছে। মনে পড়ল আমি ব'সে আছি বাদ্‌শাহী জেলের হাসপাতালে। বাইরে কতদিন হাসপাতালে গিয়ে ডিউটী দিয়েছি। রোগীর সেবা আমার একটা সখ। অসহায় পীড়িতের আত্মসমর্পণ, যন্ত্রণার ওপর করুণার প্রলেপ,—বেশ লাগে। কিন্তু আজ এইখানে দেখছি যে বীভৎস ব্যাধি, তাকে মমতা দিয়ে শুশ্রূষা করবার জোর আমার কোথায়? তার দূষিত দুর্গন্ধে আমার ন্যক্কার এল, মার্জিত সেবাবৃত্তি টিক্‌ল না।

জেল। কয়েদখানা। সমাজের আবর্জনা। তার আবার হাসপাতাল। অনাহার, অনাচার ও ব্যভিচারের সঞ্চিত রোগ। কারো মুখ দেখা যায় না। শীতের রাতে কম্বল মুড়ে প'ড়ে আছে। যেন কবরের নীচে কতক উজ্জীবিত শবদেহ,—মঝে মাঝে দম আটকে আর্তনাদ ক'রে উঠছে, মাটি ঠেলে উঠে আসতে চায়। বিছানার ফাঁকে ফাঁকে গুটিকয় হারিকেন। সরু সরু আগুনের চিল্‌তেগুলি লিক্‌ লিক্‌ করছে, তার মুখে মুখে ফোয়ারার মত ছুটছে কালো ধোঁয়া। চিম্‌নির গলায় কালি লেপে শতছিদ্রপথে বেরিয়ে আসছে বিষাক্ত আংগারিক গ্যাস। পৃথিবীর আদি উপাদান অংগার, জীবদেহের অপরিহার্য উপাদান অংগার, বিষ হয়ে আবার মানবদেহে প্রবেশ করছে।

"পঞ্চাশ জমা, ঠিক হায়, তিন নম্বর।" ঘুমের মধ্যে রসরাজ পাহারা গুন্‌তির হাঁক দিচ্ছে দফার বদ্‌লীতে।

রাত বেশী হয় নি। কিন্তু আমাদের দুজনার মাঝখানের নীরবতা বরফের মতো ঠাণ্ডা ও কঠিন। মনের উত্তাপ বুঝি জ'মে হিম হয়ে যায়। সুনীল বল্‌লে, "শুনবেন আরো?"

"না।"

"ঠিক! এ সব নোংরা কথা আপনাদের শুনবার মতো নয়।" কথায় শ্লেষ ও রুক্ষতা ছিল। লজ্জা পেলাম। কিন্তু কী করবো? "তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সে ঐ পাপীর গায় প্রথম প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করো।" যীশুর নিকষে পাপীকে আঘাত করবার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু ক্ষমা করবার অধিকার কিম্বা যোগ্যতাই কি আছে? সুনীলকে আশ্বাস দিয়েছিলাম সব পাপের ক্ষমা আছে। আছে কি?

মানবতার পূজারী বিশ্বকবিরও সন্দেহ জেগেছিল—যারা তোমার বাতাসকে করেছে বিষাক্ত, তোমার আলো দিয়েছে নিভিয়ে, তাদেরও কি ক্ষমা করেছো ভালবেসেছো তুমি? মানুষের বাড়া সত্য নাকি নেই। বলতে পেরেছেন কি বৈষ্ণব প্রেমিক মানুষের চেয়ে অসত্যাচার কে বেশী করতে পেরেছে? কে হতে পেরেছে মানুষের মতো কুৎসিত ও কদর্য?

কথা ওঠে সত্য ত' শাশ্বত নয়, সত্যেরও রূপান্তর আছে। অসত্য সত্যেরই রূপভেদ। কিন্তু একটা ত' ভিত্ চাই! আমার রুচি, শ্রীজ্ঞান আর যুক্তিবিচার,—এই দিয়ে রচনা আমার নীতি, আমার মূল্যবোধ। মূল্যবোধ দিয়ে মেপে নিই সত্যাসত্য, মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে শ্রদ্ধা, করুণা, ক্ষমা অথবা ঘৃণা। যতই পরিবর্তন হোক রুচি, যুক্তিধারা, প্রভৃতির এবং তার সাথে মূল্যবোধের,—ভাল-মন্দর তফাৎ কোনদিন ঘোচে না। কোন কলংক বাঁধা পড়ে বুকের মণিকোঠায় অশ্রুস্নাত হয়ে, কোন কলংক সারা দেহমনকে জর্জরিত করে কুটিল বিতৃষ্ণায়।

অপরাধের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফ্রয়েড ও মার্ক্স্। সুনীলের অপরাধ কি দমনপর সভ্যতার স্নায়ুবিকার না ধনবৈষম্যের অনাসৃষ্টি? ও ভদ্র গৃহস্থের ছেলে। অবসর ও বিলাসের কোলে দুর্নীতির

আবহাওয়ায় ওর জন্ম নয়। অভাবের পীড়া ও দারিদ্র্যের নিরাশা ওকে বিপথে টানে নি। ভিকৃতর য়ুগো'র 'হৃতভাগার দল'-এ ও পড়ে না। বল্মীকঢাকা ঋষির মতো মনুষ্যত্বের যে শুভ্র মূর্তিকে তিনি হাজারো অপরাধের তলে প্রত্যক্ষ ক'রে বন্দনা গেয়েছেন—কোথায় সে ঋষি ঐ নারীঘাতী ব্যভিচারীর নৃশংসতার অন্তরালে? টলষ্টয় লম্পট ও কুলটার মধ্যে সত্যের যে 'উজ্জীবন' দেখতে পেয়েছিলেন তা কি সম্ভব ঐ বীভৎস সাদনরতির মধ্যে? ওতো সমাজের চক্রান্তে পথভ্রান্ত নয় কিরণময়ীর মতো, মরীচিকায় বিক্ষুব্ধ মরুচারীও নয় দেবদাসের মতো! বিজ্ঞানী, শিল্পী, দার্শনিক এরা কেউ রাষ্ট্রনায়কদের মতো অপরাধকে ব্যক্তিরূপে দেখেন না,—দেখেন সমাজব্যাধি হিসাবে। সমাজের ভেদ বৈষম্য ও বিকার থেকে জন্ম নেয় অপরাধ। দুষ্ট ব্রণের মতো আচ্ছাদন ক'রে রাখে সুখ স্বস্তি শান্তি। আরোগ্য ক'রে দাও ব্রণ, বাইরের চিকিৎসায় নয়, সমাজ-শোধনে। অপরাধী মানুষের মধ্যে আবার ফুটে উঠবে অবিকৃত সত্যের মহিমা।

সে পথ অনেক দূরের। আপাতত ব্রণের কুশ্রী বেদনায় প্রতিহত হই ব'লেই ওর আক্রমণ থেকে বেঁচে আছি আমরা। জানি না সমাজের কোন আস্তাকুড় থেকে সুনীল সংগ্রহ করেছে তার রোগবীজাণু। জানি না কি তার প্রতিকার। রাষ্ট্রের শাস্তিব্যবস্থা নয়, শিল্পীর স্বস্তিবাচন নয়। কিন্তু আছে নিশ্চয় এর চিকিৎসা। হয়ত' মোহিত জানতো। নইলে যাবার সময়ে কেন আমাকে আর ওকে এক সংগে ব'লে গেল—"রইলে ত' সব।" আর সুনীল, ঐ জঘন্য নরকীট, ওই বা মোহিতের নাম ক'রে কাঁদল কেন? হয়ত' মোহিত ওর আড়ষ্ট মানুষটাকে জাগিয়ে দিয়েছে নতুন কিছুর ইসারা দিয়ে, রক্তের মধ্যে বেঁধেছে স্বাস্থ্য ও রোগ দুই বীজাণুর সংঘর্ষ। এই ত' শাস্তি, নইলে ক্ষমার তোষণ নয়, কারার নির্যাতন নয়। ভট্টয়ভস্‌কির কথায় দেবতার

পুনর্জন্মই অপরাধের শাস্তি। সেই পুনর্জন্ম কি হোল সুনীলের বুকে মোহিতের ছোঁয়াচ লেগে?

না, অতো সহজ নয়। দেবতার পুনর্জন্মের জন্যে করতে হয় সুদীর্ঘ আরাধনা, পাষাণী অহল্যার মতো কঠিন প্রায়শ্চিত্ত। শুধু রাঘবের পাদস্পর্শে শাপমোচন হয় না। কাজ নেই মোহিত। পংগু ও পতিতের উদ্ধার মুনি-ঋষির জন্যে, তোমার জন্যে নয়। গলিত কংকালস্তূপের ওপর দিয়ে পক্ষীরাজ ছুটিয়ে দাও। স্পার্টায় পংগুর স্থান কোরো না।

সুনীল মধ্যবিত্ত ভদ্র চাষীর ছেলে। সিঁথী সাতপুকুরে এক গিরস্ত ঘর। কিছু ধানজমি, খামারবাড়ি, আর কয়েকটা গরু এই নিয়ে সচ্ছলভাবে চলে যায় সংসার। পুকুরের মাছ, বাগানের তরি-তরকারি এ থেকেও হয় দু' পয়সা। এই নেড়েচেড়ে সুনীলের বাপ-দাদারা সংসার চালিয়ে এসেছেন।

সুনীলের বাবা নেই। বুড়ি মা, একটী বিধবা বোন আর বড়দা বৌদি আছেন, আর আর বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। বড়দা ক্ষেত খামার দেখেন। বাপ-জ্যেঠারা উচ্চ প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছিলেন। বড়দা ম্যাট্রিক পর্যন্ত গিয়ে আর পাশ করতে পারলেন না—কাজেই বাপ-দাদার সাবেকী জীবনধারাকে সব দিক দিয়ে শ্রেয় ব'লে মেনে নিতে বাধেনি। বেশ চলছিল সংসার। দুর্ভাগ্যক্রমে সুনীল ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ফেলল্। তার সাধ হোল কলেজে পড়বে। দাদার মত ছিল না। কিন্তু মা ছোট ছেলের আব্দার এড়াতে পারলেন না।

ছেলে কলেজে ভর্তি হোল। ন'টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে বেরুতে হয়, কষ্ট হয়। তাই পূজোর পর সুনীল গিয়ে উঠল হস্‌টেলে, ছুটিছাটায় বাড়ি আসে মাকে দেখা দিতে।

কলেজে গিয়ে প্রথমেই ও এক স্বদেশী দলের পাল্লায় পড়ে। হস্‌টেলে গিয়ে উঠবার কারণও তাই। নিয়মিত আখ্‌ড়ায় যেতো। এখানেই ওর অনেক কিছুর হাতেখড়ি। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে,—বনা-দা নিজ হাতে ওকে শেখালেন ছোরাখেলা, দড়ি দিয়ে পাঁচিল টপ্‌কানো, পাইপ বেয়ে দোতলায় ওঠা-নামা, ইত্যাদি। আর শেখালেন মোটর চালানো। সুনীল সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠল কয়দিনে। কিন্তু কেন এসব তা ভালো ক'রে বুঝতো না। জানতো ইংরেজ তাড়াতে হবে, কেমন ক'রে তা জানতো না। জানতে চাওয়া বে-আইনী, জানবার যে বিশেষ গরজ ছিল তাও নয়। শিখবার উৎসাহ আর দলের মোহ,—এই যথেষ্ট।

একদিন আচম্‌কা এল বনা-দার এক হুকুম। আদর ক'রে পিঠ চাপড়ে বল্‌লেন,—"সুনুর এবার পরীক্ষা, প্যারবি ত' ভাই ?" সুনীল নির্ভয়ে তৈরী। কিন্তু যা শুনল তার জন্যে ও মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ডাকাতি হবে, ওকে যেতে হবে মোটর নিয়ে। মুখটা ছোট হয়ে গেল। মাথা নীচু করে আম্‌তা আম্‌তা যা বল্‌ল তার মানে—ছি ছি, এ নোংরা কাজ;—ইংরেজ তাড়ানো নয়, দেশের ভাইর ঘরে ডাকাতি? বনা-দা চ'লে গেলেন। একটু বাদে একজন লোক এসে বল্‌লে—"তুমি আর আখ্‌ড়ায় এসো না। যদি এদিকে পা বাড়াও কিম্বা কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পায় এসব কথা তা-হলে তোমার জীবন জামিন রইল আমাদের কাছে।"

আসল কথা সুনীল ভয় পেয়েছিল। বিবেকের মাষ্টারীটা আত্মবঞ্চনা। ছোরা ঘুরিয়ে আর মোটর চালিয়ে বিপ্লবী তৈরী হয়

না। দলের ওপর মোহ ছিল শ্রদ্ধা ছিল না। মোহ কাটতে ক'দিন লাগে?

নেশার মৌতাত একবার পেলে নেশা ছাড়া কঠিন। একটা গেলে আর একটা ধরতে হয়। সুনীল ধরল মেয়েমানুষ। খুঁজে নিতে পারলে ছাত্রদের মধ্যে সব রকমের বন্ধু মেলে। সুনীলের চেহারা সুন্দর এবং সে অনেক গুণে গুণী। শাঁশাল কাপ্তান বন্ধু অনায়াসেই জুটল। চিৎপুরে যাতায়াত সুরু হোল। প্রথম প্রথম যেতো গান শুনতে, চাকচিক্য দেখতে, নতুনের প্রতি কৌতূহলবশে। একটু একটু ক'রে শিখল সব। বন্ধু দরকার হোল না। নিজের পায়ে চলতে ফিরতে শিখল। টাকা পয়সার বিশেষ প্রয়োজন হোত না। বয়স আর চেহারার গুণে কাজ চ'লে যেতো।

ওখানে একদিন গফুর সর্দারের সংগে আলাপ। ভারি মিষ্টি সদালাপী লোক। কে বলবে কল্‌কাতার বিখ্যাত গুণ্ডা? প্রাণখোলা হাসি, ঈর্ষাদ্বেষ নেই এক রত্তি। বার রেস্তর্‌াঁয় গিয়ে খাওয়াল সুনীলকে। তারপর নিয়ে গেল তালতলায় নিজের বাড়ি। দুটী বউ তার। সুনীলের সংগে দিব্যি আলাপ করল। কোন জড়তা নেই। কিসের মুসলমানী পর্দা? যেমন ভদ্র তেমনি সচ্ছন্দ। গফুর সর্দারের সংগে সুনীলের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। প্রায়ই আসে যায়, সর্দার নানান্ জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায়, খাওয়ায় দাওয়ায়, হরেক রকমের সখ মেটায়, পয়সা-কড়িও দেয়। বউ দুটীও যত্ন করে

এখানেও সুনীলের মোহমুক্তি হোল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ। সুনীলের বয়স তখন বাইশ। সর্দার ওর চেয়ে বিশ বছরের বড়। একটা বিসদৃশ অশিষ্ট ব্যবহারে ওর সারা দেহমন ঘিন ঘিন ক'রে উঠল। সর্দারের ক্ষমতা বহুমুখী। দুটী ঘরস্ত্রী, পরস্ত্রী, বারস্ত্রী এতেও তার ক্ষান্তি হয় না। এর পরে এবং ওপরে তার

আকাংখা সুশ্রী তরুণের প্রতি। সুনীল আপত্তি করল। কিন্তু এখন নিরুপায়। সর্দারের অনেকগুলি বাহু। নরম তলতলে অক্‌টোপাসের বাহু। জুলুম জবরদস্তি সে জানে না। টানাটানি করলে রাশ ছেড়ে দেয়, মিষ্টি হাসে, যেন—কতদূর যাবে যাওনা দেখি। রাগ করলে নতুন নতুন সখের মাল হাজির করে। আশ্চর্য! কল্‌কাতার ভদ্র অভদ্র, সরকারি বেসরকারি সব রকমের মেয়ে ওর জোগাড়ে আছে। সুনীলের মন আস্তে আস্তে যেই নরম হয়ে আসে অম্‌নি সর্দার ঘাত বুঝে কোপ দেয়। অসহ্য।

বেশী জট পাকানো ফাঁসের রীতি এই যে গেরো একদিকে যতো কষতে থাকে আর একদিকের আঁট ততো ঢিলে হয়। শিকার ও শিকারী কেউ টের পায় না, হঠাৎ দেখা যায় একদিকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা খোলা। একদিন সুনীল এসেছে, সর্দার বাড়ি নেই। ছোট বউ আসমানী যত্ন ক'রে বসাল, খাওয়াল দাওয়াল। তারপর এমন সব কাণ্ড-কারখানা সুরু করল যে বলা যায় না। বকল আবোল-তাবোল অনেক, যার মানে—সুনীলকে দেখে অবধি ও জলেপুড়ে মরছে, সে কি বোঝে না কিছু? কিন্তু মেয়েটা কথার চেয়ে কাজে পটু, সর্দারের উপযুক্ত গৃহিণী। বছর আটেকের বড় সুনীলের চেয়ে, ভাবতে বুঝতে সময় দিল না।

দু'দিন বাদে সুনীল আসমানীকে নিয়ে উধাও হোল। না, তার উল্‌টো। আসমানী উধাও হোল সুনীলকে নিয়ে, আর কিছু গয়নাপত্তর টাকাকড়ি। দু'জনেই সর্দারের ফাঁস থেকে বাঁচল, কিন্তু নতুন ফাঁস চড়ল গলায়, বিশেষ করে সুনীলের। সর্দারের ফাঁস কখনো আঁট হোত, কখনো আল্‌গা হোত, এ ফাঁস ক্রমশ কষতেই লাগল।

পড়া ছাড়ল সুনীল। কাজে ছেড়েছিল অনেক আগে, এবার নামেও। গিন্নী পোষার চেয়ে শক্ত হাপু-গিন্নী পোষা, তার ওপর আবার গফুর সর্দারের চোরাই মাল। পুরোনো কাপ্তান বন্ধুকে ধ'রে কষ্টেসৃষ্টে একটা চাকরি জুটল। কলকাতার এক বনেদি পরিবারে শফার। গাড়ি সারাবার সাফ করবার লোক আলাদা। সে শুধু চালায়। মাইনে পঞ্চাশ টাকা, তাতে কুলোয় না। ছোট-মা স্নেহ করতেন। সুনীল বানিয়ে বানিয়ে বলতো দুঃখের কাহিনী। ছোট-মার একটুও সন্দেহ হতো না। শোনামাত্র অভাব মিটিয়ে দিতেন।

তবু চলে না। আসমানীর খাঁই মেটাতে প্রাণান্ত। কেবল টাকাকড়ি নয়, অফুরন্ত তার সংগতৃষ্ণা। ঘর থেকে বেরুনো যাবে না অথচ রোজগার চাই, এ এক ঝকমারি। এক একবার ভেবেছে ফেলে পালায়। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। সর্দারের গৃহিণী, নাগিনীর চেয়ে ভয়ংকরী। ওর নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে এবং প্রতিশোধ নিতে জানে। কিন্তু এ ভাবেই বা কতদিন চলে? একদিকে অনুরাগ মেটে না, অন্যদিকে অনুরাগ টেকে না। দুপক্ষেরই স্নায়ু টনটনিয়ে ওঠে।

ফলে যা ঘটল তা খুব স্বাভাবিক। একদিন আবিষ্কার হোল আসমানীর নতুন প্রণয়ী। অবশ্যি সুনীলের কাছে নতুন, আসলে পুরোনো। এই মান্নু। আসমানী বড় ঘরের মেয়ে। ডাকাতির মালের সংগে মান্নু বের ক'রে আনে ওকে। প্রথমে নিজের কাছে রাখে। তারপর বাটোয়ারায় ও সর্দারের ভাগে পড়ল। সর্দার উদার

প্রকৃতির লোক, নিকে ক'রে নাম দিলে আসমানী। সর্দারের ওপর মান্নু কথা বলে নি। কিন্তু সুনীল ছোঁড়া কে? মান্নুর আসমানীকে চাই। সুনীলেরও রোখ চেপে গেল। ঈর্ষার জ্বালায় ও রেষারেষির জিদে বিতৃষ্ণার জায়গায় ফিরে এল আশক্তি। তাই আবার আসমানীর তোয়াজ করতে হোল। পৌরুষ জাহির করতে হলে চাই রোজগার। চাকরি বা ভিক্ষার রোজগার নয়, গফুর ও মান্নুর পথের রোজগার। মাঝে মাঝে ছোটমাকে ব'লে ছুটি নিয়ে বেরুতো। দু'একটা সাকরেদ নিয়ে ছোটখাট রাহাজানি করতো। বীরদর্পে আসমানীর সামনে ফেলে দিতো। ও মেয়েও ভারি চালাক। সুনীলকে দেখিয়ে দেখিয়ে মান্নুর সুতো টানতো। সুনীলকে উস্‌কে দিতো নতুন নতুন অপরাধ-বৃত্তিতে।

একদিন মান্নু হাতে হাতে ধরা প'ড়ে গেল সুনীলের কাছে। প্রথমে আপোষে ঠাট্টা ইয়ার্কি, তারপর বচসা। শেষে মান্নু ছোরা বের করল। কিন্তু ও অস্ত্রে সুনীলের শিক্ষা বনা-দার কাছে। পাটনার গুণ্ডা একটা কেন, দুচারটার সংগেও সে মুকাবিলা করতে পারে। মান্নু পালাল। ক'দিন আর এমুখো হোল না। অস্ত্র ছাড়া শাস্ত্র আরো আছে যার জোরে ও সুনীলকে হাটে হাটে বেচতে পারে। একদিন সুনীল বাড়ি ফিরে দেখল ঘর খালি। শুধু মানুষ নয়, গয়নাপত্তর টাকাপয়সাও অন্তর্ধান করেছে। ক'দিন পরে খোঁজ পেল মান্নু আসমানীকে নিয়ে কলম্বোর জাহাজে পাড়ি দিয়েছে—খালাসি না বাটলার কি একটা হয়ে।

জীবনে এই প্রথম হার এবং মর্মান্তিক। সুনীলের জীবন-যাত্রার কেন্দ্র নারী, নারীর প্রতিযোগিতায় ও পরাস্ত, লাঞ্ছিত। কি হবে জীবিকায়? চাকরির গোনা টাকায় খেয়ে বেঁচে থাকা, এ অসম্ভব। শিখতে হবে দুর্বৃত্তির শিল্পসাধনা,—মানুষমারা, মেয়েঠকানো, টাকা-

লুঠ, সব কিছুর কলকৌশল। বনাদার দলের সংগে গাড়ি নিয়ে যেতে ও ভয় পেয়েছিল। এই ত' সেদিনের কথা। হাসি পায় ভাবলে।

চাকরি ছেড়ে দুঃসাহসী অপরাধের পথে নামল সুনীল। একদিন বার-রেস্তরাঁয় একটা লোক পেছন থেকে ওর কাঁধে হাত দিল। গফুর সর্দার। জড়িয়ে ধরল সুনীলকে,—"বাপ্‌কা বেটা। হাতে হাত দাও ভাই।" সুনীল ভয়ে ও বিস্ময়ে ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল। সর্দার বুঝতে পেরে বল্‌লে—"সে সব আর হবে টবে না, ভয় নেই। গফুর সর্দারের বউ ভাগিয়েছ, এমন হিম্মৎ কার? তুমি আমার পয়লা নম্বরের সাকরেদ হবে।" সুনীল তক্ষণি দলে ভর্তি হোল। বনা-দার শিক্ষা আর সর্দারের নেকনজর ওর উন্নতির রাস্তা খুলে দিল।

একটা পরীক্ষা পাস করতে হোল প্রথমে। এখন ও আর স্বদেশী দলের ভীরু সুনীল নয়, পাক্‌কা বদ্‌মায়স। মতিলাল পান্নালালের গয়নার দোকান। নিজাম না গায়কোয়াড় কার নাত্‌নীর বিয়ে, সুনীল ষ্টেটের চীফ্‌ সেক্রেটারী না কি যেন। হাজার পঞ্চাশ টাকার গহনা ফরমাস ক'রে পাঁচ হাজার আগাম ফেলে দিল। তারপর নির্দিষ্ট তারিখের চার পাঁচ দিন আগে চীফ সেক্রেটারী হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত। সংগে রাণীমার মহিলা সেক্রেটারী। ব্যাপার কি? না, বিয়ের দিন এগিয়ে গেছে, আপনাদের যা যা ডিজাইন আছে বের করুন, বেছে গুছে ঐ থেকে কাজ উদ্ধার করতে হবে। বেশ রাত হয়েছে। দোকান বন্ধ হবার সময়। রাস্তায় লোক চলাচল নেই। কিন্তু এমন খদ্দের ফিরিয়ে দেয় কে? দোকানদাররা সিন্দুক খুলে সব বাইরে সাজালেন। বস্‌। মোটর থেকে সেক্রেটারীর দেহরক্ষীরা দু'জন উঠে এল। নির্বিবাদে লাখখানেক টাকার মাল নিয়ে চম্পট দিলেন সেক্রেটারী, মহিলা সেক্রেটারী, আর রক্ষীরা দুজন। পুলিশে যে টের পেল না তা নয়। হাজার পঁচিশ গেল সেদিক সামলাতে।

সর্দার খুসী হয়ে সুনীলকে ইনাম দিলেন একটা দশঘরা কোল্ট্ রিভলভার।

ধরাকে সরাজ্ঞানে কেটে গেল কয়েকটা বছর। বেপরোয়া জীবন, অজস্র অর্থ, আর মদ মাংস মেয়েমানুষ, উচ্ছৃংখল পথযাত্রার রসদ অফুরন্ত। পুলিশের চাইরা সব মাসোহারা পান, কে লাগবে পেছনে? কলকাতায় তখন গফুর সর্দারের রাজত্ব। তার ডান হাত সুনীল। তাকে পায় কে?

শেষে পেল তাকে একজন। টেগার্ট সাহেব গুণ্ডার পেছনে লাগলেন। গুণ্ডা আইন পাশ হোল। আর আর পাণ্ডারা সব গ্রেপ্তার হয়ে একটা না একটা মামলায় পড়ল। লম্বা লম্বা সাজা হয়ে গেল সবার। পুলিশ সুনীলের নাগাল পেল না বটে, কিন্তু একেবারে কাবু ক'রে দিল তাকে। ভাঙা হাটে, ভাঙা হাতে কি করবে সে? বড় বড় কারবারগুলো ফেঁসে গেল। আভিজাত্য খুইয়ে সে হীনতর দুর্বৃত্তির পিছল পথে পা বাড়িয়ে দিল। জীবন বিস্বাদ হয়েছে, কিন্তু তার ওপর আর নিজের হাত নেই।

তখন স্বদেশী খুনজখমের মরশুম। সর্দারের দেওয়া কোল্ট্ রিভলভারটা কাজে লাগল। ঐটে বিক্রী করার লোভ দেখাতো আনকোরা স্বদেশী ছোকরাদের। বনা-দার আখ্ড়ায় খোঁজ মিলল তাদের একজনের। এ একটা নমুনা মাত্র। বেল্জিয়াম থেকে বাক্স বোঝাই মাল এসেছে, খুলবার ওয়াস্তা। মোটা টাকা নিয়ে খদ্দের এল অন্ধকার রাত্রে ওর খপ্পরে। টাকাটা রেখে খালি হাতে প্রাণ নিয়ে ফিরল।

এ ব্যবসা বেশীদিন চলে না। তখন ধরল ঐ পতিতা নারীর ওপর দস্যুবৃত্তি। এই সময়ে ওর মা মারা গেলেন। তা নিয়ে ভাববার সময় নেই। অতিষ্ঠ হয়ে ঢাকা পালাল। সেইখানে ধরা পড়ল

ভারতরক্ষা আইনে। গুণ্ডা সিক্যুরিটি হয়ে ঢাকা, বহরমপুর তারপর বাদশাহী সেণ্ট্রাল জেল।

আগুন নিভে গেছে। দাহ নেই, আছে ছাই আর অন্ধকার। সুনীল জীবনে এই প্রথম পিছন ফিরে তাকাল। অনাচারের বদলে নারীর কাছ থেকে পেয়েছে কুৎসিৎ ব্যাধি। জেলের হাসপাতালে কাটায় বারটা মাস। চিকিৎসা ভালই হয়, কারণ ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার-দের তুষ্ট করবার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু রোগ সারে না। ব্যথার উপসর্গের মধ্যে পিছনের দিনগুলি এসে মনের দরজায় কড়া নাড়ে। অংগারস্তুপের ভেতর কয়েকটা হীরামাণিক জ্বল জ্বল করে।

মনে পড়ে ছোট-মার কথা। আসমানী পালিয়ে গেল, কী যন্ত্রণা সারারাত! পরদিন গাড়ি বের ক'রে নিত্যিকার মতো ছোট-মাকে প্রণাম করতে এল। ছোট-মা একটী গরদের শাড়ি প'রে পূজোর ঘর থেকে বেরুচ্ছেন, মূর্তিমতী কল্যাণী। ওকে দেখে চমকে উঠলেন। "একি সুনীল, তোমার কি অসুখ?" ব'লেই ওর কপালে হাত দিলেন। সুনীল ফাঁপরে প'ড়ে বল্লে "কিছু নয় মা।" "বল্লেই হবে কিছু নয়, মুখচোখ কালি হয়ে গেছে।" পীড়াপীড়িতে সুনীল যা বল্ল তার মানে এই—একটী মেয়েকে সে ভালবাসতো। কাল অন্যের সংগে তার বিয়ে হয়ে গেল। কিছুতেই মন স্থির রাখতে পারছে না। ছোট-মার চোখ অমনি ভিজে গেল। বল্লেন, "তোমার ভালবাসা যদি খাঁটি হয় তা হলে একদিন তাকে পাবেই। এ জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন সুনীল। দুঃখু কোরো না।" সুনীল দৌড়ে

পালিয়ে এল। ছোট-মা যেন কী! কারও কথা অবিশ্বাস করতে জানেন না।

ছোট-মার কথা কিন্তু ফলেছিল। সুনীল পেয়েছিল আসমানীকে। দু-চার বছর মানুষের সংগে এদিক সেদিক ঘোরার পর দু'জনে ছাড়াছাড়ি হোল। সুনীল খবর পেল আসমানী মসজিদ্‌বাড়ি লেনে দোকান সাজিয়েছে। সুনীলের তখন ঐ শেষ সময়ের ব্যবসা—গেল সেখানে। আসমানী ওকে জড়িয়ে ধরল—"তুমি! তুমি এলে সুনু, সোনা!" তারপরে মদের সংগে যখন ওকে বিষ খাইয়ে দিলে, ও বল্‌লে—"হাঁগা দেখো, আমার গা যেন কেমন করছে।" উত্তেজনায় অসম্বদ্ধ কথা—"দেখো না গা একজন ডাক্তার।...তুমি আমায় বিষ দিলে না ত' সোনা?....না না—বল তুমি বিষ দাওনি।...উঃ বাঁচব না...আমার বুকের ওপর মাথা রাখো লক্ষ্মীটী।....এই চাবি...ঐ সিন্দুক....বিয়ে কোরো সোনা....সিন্দুকের কোনে রূপোর সিঁদুরের কৌটো, বৌকে দিও।"

মনে পড়ে মার কথা। যখন ও কলেজে পড়তে চেয়েছিল, দাদা বাদ সাধলেন। মা বলেছিলেন—"আহা, পড়তে চায় পড়ুক না, লেখাপড়া কি খারাপ রে?" তারপরে যখন চিৎপুরে আনাগোনা সুরু করল তখন আর সব ছুটিতে বাড়ি যাওয়া হোত না। শনিবারে ব'সে মা দিদিকে নিয়ে খাবার তৈরী করতেন, কোনবার চন্দ্রপুলি, নইলে সরু-চাকলি, তালের বড়া, চিকন চিঁড়ের পায়েস। রবিবার সারাটা দিন খাবার আগলে মা ছেলের পথ চেয়ে ব'সে থাকতেন, —দাদা বলতেন, শুধু শুধু হা-পিত্যেস ক'রে ব'সে থাকা। আমি আগেই বলেছিলুম। দেখো এখন কোনো বদমাসদের দলে পড়ল কিনা। মা ফোঁস ক'রে উঠতেন—শুনতে পারিনে তোর অলুক্ষুণে কথা। পাসের পড়া পড়তে পড়তে ছেলে হয়রাণ হয়ে গেল আর উনি এলেন

বাগড়া দিতে। তারপর দু'তিন হপ্তা বাদে ছেলের দেখা পেলে বলতেন—"হাঁরে তুই এমন ক'রে আমায় ভুলে থাকবি জানলে তোকে কলেজে দিতুম না।"

ছেলে পাসের পড়াই পড়ল, পাস আর দিল না। বল্‌লে—"চাকরি পেয়েছি, রাজবাড়িতে মোটর চালাই, আর ও ছাই পাস দিয়ে কি হবে?" মা বল্‌লেন—"তোর বাপদাদারা কেউ চাকরি করে নি—ছেড়ে দে ও। যে-থা কর, গেরস্তালি দেখ। আমি না হয় বুড়ি ধুড়ি ফিরেও তাকাস না। কিন্তু এই যে বোনগুলো বাপের বাড়ি আসে, বউটা রয়েছে পরের মেয়ে, এদের দিকে ত' একবার চেয়ে দেখতে হয়।" ছেলে বল্‌লে—"জানো না মা, রাজার বউ ছোট-মা আমাকে কতো ভালবাসেন। লেগে থাকলে পরে দেখবে কতো উন্নতি।" বিষণ্ণমুখে চুপ ক'রে থাকতেন মা।

এরপর তখন সুনীল চাকরির ফাঁকে ফুরসুতে রাহাজানি করে আসমানীর মন জোগাবার জন্যে। তখন বোনেরা বাড়ি এসেছে। মার কথা মনে ক'রে একদিন সুনীল চারটে ঝক্‌ঝকে মটরমালা নিয়ে এল বোনেদের নামে নামে। মা আঁৎকে উঠলেন—"একিরে, এসব কি?" সুনীলের তৈরী জবাব—"ছোট-মা দিলেন"। কী আশ্চর্য্য! তার বোকা গেঁয়ো মা, বরাবর তাকে সে যা খুসী তাই বুঝিয়ে এসেছে, আজ কিছুতে তিনি বুঝলেন না। সেই পাণ্ডুর মুখে আর শ্রী ফিরে আসে নি। সেই যে বিছানা নিলেন আর ওঠেন নি।

শেষে লাবণ্য।

তখন সুনীল গফুর সর্দারের ডান হাত, কলকাতার ডেপুটী রাজা। একদিন দেখল শিশুকল্যাণ আশ্রমের সামনে লোকের ভিড়। একটি নবজাত শিশুকে কে ফেলে রেখে গেছে—বোধ হয় কোন পথভ্রষ্টার অবাঞ্ছিত সন্তান। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছে। কী খেয়াল হোল, সুনীল

তুলে নিয়ে এল। ঘর ভাড়া করল, দাই রাখল, বাঁচিয়ে তুলল মেয়েটিকে। দয়ামায়া নয়, একটা নতুন খেয়াল।

লাবণ্য কচি কচি হাত দুটি বাড়িয়ে ডাকে 'আব্-বা'। ভয় পেয়ে যায় স্থনীল,—আবার বুঝি ফাঁস লাগে। দূরে দূরে থাকে, সাকরেদরা ঠাট্টা করে,—মেয়ে পেলে, মেয়ের মা আনো এবার একটা।" "কই, কিনলে সাবুদানা আর মিছরি?" একবার ভাবলে ছোট-মার কাছে দিয়ে আসে, সাহস হোল না। শেষে নার্সারিতে দিল। আর একটু বড় হলে হস্টেলে দিল, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতো। লাবণ্যর অফুরন্ত প্রশ্ন, ওগুলোকেই ওর ভয়—"সব্বার বাবা ছুটিতে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়, তুমি আমায় নাও না কেন? সব্বার মা আছে আমার নেই কেন? বল না আমার মা ম'রে গেছে নাকি? ম'রে গেলে আর আসে না? মাষ্টারদি বলছিলেন, যীশু মরা মানুষ বাঁচিয়ে দিতে পারে। আচ্ছা খুব যদি যীশুকে ডাকি?" স্থনীল পালিয়ে বাঁচতো।

"আপনি কি ভাবছেন জানি। কী দরকার ছিল এই বিশ্রী জীবন বয়ে বেড়াবার? অন্যের জীবন নিয়ে খোলামকুচি খেললুম, আর নিজের জীবনটাকে শেষ ক'রে দিতে পারলুম না?"

"ঠিক বলেছেন।"

"পারলুম না ঐ লাবণ্যর জন্যে।"

"বেঁচেই বা তার কী করলেন?"

"সত্যি কথা। জেলে আসার পর সব খুলে লিখলাম ওদের হেড-

মিস্ট্রেসকে। মিনতি করলাম লাবণ্যকে যেন পড়তে দেন তিনি, আমি বেরিয়ে গিয়ে সব ঋণ শোধ করব। আমাকে দেখে ওকে যেন তিনি ঘৃণা না করেন। কোন উত্তর পাই নি। তারপর অনেকদিন গেছে। দিনকয়েক আগে লাবণ্যর চিঠি পেয়েছি, তার প্রথম চিঠি।"

সুনীল জামার ভেতর থেকে ছোট ক'রে ভাঁজ করা একটা চিঠি বের করল। আমার হাতে দিয়ে হারিকেনটা তুলে রাখল মীট্-সেফের ওপর। পরিষ্কার গোটা গোটা লেখা, লেখিকার চরিত্র ফুটে বেরুচ্ছে।

মাননীয়েষু,

আমি সব জানতে পেরেছি। ভাবতে লজ্জা হয়, দুদিন আগে আপনাকে 'তুমি' আর 'বাবা' বলেছি। আপনার অন্নে বড় হয়েছি ভাবলে নিজের রক্তমাংসের ওপর ঘেন্না ধরে। ভগবান আমাকে খারাপ হবার জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীও চক্রান্ত করেছে আমাকে ভালো হতে দেবেনা। বাবা, মা, আপনি, মিস্ট্রেস, বন্ধুরা, চারদিকের পুরুষগুলো সবাই মিলে কি চক্রান্ত করেছে? হয়ত' বা এই নিয়ম। আমি খারাপ হবো।

এবার ম্যাট্রিক দেবার কথা ছিল, দেবনা। একটা সিনেমা কোম্পানীর সংগে কথা বলেছি। যদি রোজগার করতে পারি তবে যতো টাকা খেয়েছি আপনার নামে জেলগেটে জমা দেবো। আপনার কাছে এই আমার প্রথম চিঠি এবং এই শেষ। কোনদিন আমার খোঁজ করবেন না।

—লাবণ্য

শেষ হোল সুনীলের কথা। কম্বলের পিঠে শীত জ'মে উঠেছে। পদ্মার চরে হাওয়া নেই। নিথর রাত্রি। এমন সময়ে হিমক্লিষ্ট রুগ্ন

কয়েদীদের দেহগুলি ঝাঁকি দিয়ে কাসির রোল উঠল ব্যারাকের এক-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি। হাসপাতালের শেষ রাত্রির কাসি, শৃগালের ডাকের মত সংক্রামক, বিচিত্র নারকীয় ঐক্যতান। যেন প্রেতলোকে সাড়া প'ড়ে গেল, কয়েকটা জীর্ণ হাড়-পাঁজরের বাধা তারা মানবে না। ঘট্ ঘট্ ক'রে ব্যারাকের তালা ন'ড়ে উঠল আর ঘুমন্ত রসরাজের মুখে কয়েদী জমা হোল—"পঞ্চাশ জমা, ঠিক হ্যায়, তিন নম্বর।"

সিক্‌মান

ঢেকিচালির মাঠে নিয়মিত চক্কর দিয়ে এলাম।

পূবের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে কাত্‌ হয়ে বিছানাগুলোর ওপর। প্রভাতী আলো ধুয়ে মুছে দিয়েছে রাতের গ্লানি। যে যার বিছানায় উঠে বসেছে, প্রতিবেশীর সংগে আলাপ আরম্ভ করছে সিক্‌মানের রাজনীতি আর সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে। নমস্কার করলাম উষসী আলো-কে। হে সাবিত্রি! মুছে দাও রাত্রির দুঃস্বপন। এই রোগ-মসীঢালা পাপ-কলুষিত জেলের হাসপাতালে তোমার জিয়ন-কাঠি বুলিয়ে দাও।

মাঠের ওপর থেকে ডাক এল—"হেই মাড়ি লেবা—হেই ফাল্‌তু, মাড়ি লাও মাড়ি লাও।" মাঠের মাঝখানে রাস্তাটার ওপর ঢেকি-চালির কয়েদীরা ফাইল বেঁধে খেতে বসল। মাড়ি,—মানে নুন দেওয়া গরম মাড়-ভাত এই প্রাতরাস থালায় নিয়ে বসেছে সবাই। মেট্‌-পাহারা পেছনে দাঁড়িয়ে সুযোগ মতো গালাগালি দিচ্ছে। তৃপ্তির সহিত খাচ্ছে বুভুক্ষু কয়েদীর দল, ভ্রূক্ষেপ নেই গালাগালিতে, কিন্তু বিদ্রোহও নেই বাঁধাধরা শৃংখলার বিরুদ্ধে। জোয়ালের বলদের মত নির্বিরোধী মানুষ।

জানি ওদের কোন দোষ নেই। আমার মূল্য-বিচারে নিষ্পাপ, নিরপরাধ ওরা। অভাব ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ওরা যে প্রতিবাদ জানিয়ে জেলে এসেছে তাতে সভ্য রুচি ও নীতির শাসন ছিল না, কিন্তু তাতে ছিল প্রকৃতির স্বাক্ষর। কোথায় এখন সেই বলিষ্ঠ বর্বরতা? ঐ ফাইল-বেঁধে-মাড়ি-খাওয়া, পঁচিশ টাকার সিপাইর ভয়ে তটস্থ ঢেকি-চালির শ্রমিক কয়েদীর দল, ওরাই নাকি খুন ডাকাতি আর মেয়ে-চুরির আসামী! ওরা দ্রবীভূত অংগার, আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

না, এর চেয়ে পাপ ভালো, অপরাধ ভালো। মানুষের বুকে আগুন বেঁচে থাক। বেঁচে থাক বাঁচবার দুরন্ত চেষ্টা, অন্যায়-অমংগলকে জাপ্‌টে ধরবার অবাধ্যতা। সুনীল ওদের চেয়ে হাজারো গুণে ভালো। জীবনপ্রগতি মানুষের কপাল ভ'রে দুঃখ লেপে দিয়েছে, ঈর্ষা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বে কণ্টকিত করেছে তার যাত্রা,—যা দেখে বুদ্ধ বলেছিলেন নির্বাণ করো ঐ জ্যোতির বিন্দু, শপেনহয়ের বলেছিলেন ধ্বংস করো ব্যক্তিত্ব, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞান দিয়ে জীবন-সংকল্পকে সংহার করো; আবার যা দেখে নীট্‌শে বলেছিলেন বরণ ক'রে নাও জীবনযুদ্ধের দুঃখ, উড়িয়ে দাও মানুষজাতির বৈজয়ন্তী, দূর ক'রে দাও অহিংসা দয়া ইত্যাদি দাস-যূথের ধর্ম,—তবেই হবে অতিমানব। কয়েদীদের দেখলে করুণায় বুক ভ'রে যায়, কিন্তু অন্যের করুণা জাগিয়ে কে কবে বাঁচতে পেরেছে? সুনীল বেঁচে থেকেছে বেশ করেছে। কে জানে অতিমানব আসবে কিনা কিম্বা কী সে জীব? কিন্তু শীতায়মান এই গ্রহের বুকে যারা জীবনের উত্তাপ নিয়ে বেঁচে রইল, শত অপরাধ-অন্যায়ের কলংক বয়েও বেঁচে থাক তারা।

রোগীরা উঠে নিজ নিজ বিছানা পাট করল। কম্বল দিয়ে সারা বিছানা পরিপাটি ক'রে মুড়ে ফিট্‌ফাট হয়ে বসল। ডাক্তারবাবু

আসছেন। সবাই যার যার নালিশ নিবেদন করবার জন্যে মহড়া দিয়ে নিল।

"কেমন আছেন নিমেষবাবু?" ডাক্তারবাবু ঢুকতে না ঢুকতে অনেকগুলি সেলাম তাকে আক্রমণ করল। ভাবী অবস্থাটা এঁচে নিয়ে তিনি সতর্ক হলেন। দাঁতখিঁচিয়ে বল্লেন,—"তোমাগো সেলাম নেবার লাইগা আমার একটা লোক রাখতে হইবো দেখতাছি।"

বুড়ো এরফান প্রায় মরিয়া হয়েছিল,—ঘাবড়াল না। দু' পায়ের ওপর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌ল—"হুজুর আম্‌রার মা-বাপ। আপ্‌নে না ছাখ্‌লে ত' এদ্দিনে মরলাম অইলে।"

"আইজ্ঞা হুকুম করেন।"

"হুজুর মরতে লইসি, বুড়ার কথায় গোসা হইয়েন না। একপোয়া দুধ দেয়, তাও জলের লাহান……"

"কই হে ম্যাট্ !" গণি এগিয়ে এল,—"কামবিলাসী (কন্‌ভেলেসেণ্ট-এর জেল-পরিভাষা) আছে সার।"

"কামবিলাসী? তবে আর কি! সেরখানেক কইরা ক্ষীর দিবা। আর দই, মাখন। আর কী? বলেন মিঞা সাহেব, পোলাও, কালিয়া?"

হি-হি ক'রে হাসতে লাগল আশপাশে কয়েদীর দল। বুড়ো এরফান লজ্জায় বিস্ময়ে আশ্রয় খুঁজতে লাগল একটা। ডাক্তারবাবু নিজের রসিকতায় পুলকিত হয়ে ভাবলেন শেষ মারটা দেখিয়ে দিই। "লেইখ্যা দেই, কী বলেন? আবার ম্যাটে যদি ভুইলা যায়?" এরফানের টিকিটটা নিয়ে কি যেন লিখলেন।

আর কেউ নালিশ জানাতে সাহস করল না। দু'একটা মামুলি টিপ্‌পনি সেরে ডাক্তারবাবু আমার কাছে এলেন। "আপনে কেমন আছেন?"

"রক্তটা বন্ধ হচ্ছে না।"

"সাইরা যাইবেন। একটু সুস্থ হইলেই দেখবেন অসুখটা কইমা গ্যাছে।"

"ওষুধপত্র কিছু?"

"ছাখেন! গরীবের কথাখান শুইনা খোয়েন। এমন পদ্মার বাতাসের কাছে কিছু না। ওষুধ মানে ত বিলাতী পচা মাল। আপনারা স্বদেশী হইয়াও যদি এই কথা কন,—"

আর কথা বাড়ালাম না। ডাক্তারবাবু বিক্রমপুরের কায়েত। জেলের ওষুধ গোপনে বাইরে যায়, এ বাজারে দু-পয়সা আনে। কাজেই আমাদের চিকিৎসার কাজ যথাসম্ভব সারতে হয় আশ্বাস-বাণী ও বিশুদ্ধ জলবায়ু দিয়ে। বিদায় ক'রে বাঁচলাম, নইলে রোগের উপসর্গ শুনবার ভয়ে এখনি যুদ্ধের বক্তৃতা সুরু করতেন। যাওয়ামাত্র এরফান টিকিটটা নিয়ে কাছে এল। সাথে সাথে কৌতূহলীর দল, "ল্যাখল কি হালার পুত?" এরফান বেশীক্ষণ পায়ের ওপর ভর দিয়ে থাকতে পারে না। পাশে বসিয়ে টিকিটটা নিলাম। ডাক্তারবাবু লিখেছেন, —"ডিস্‌চার্জ, ফিট ফর অয়ল-প্রেস।"

"ছাখ্‌স নি হালার কান্‌ডটা!" "এই বুড়ারে ঘানি পাস করল?" বিস্ময়ে চাঞ্চল্যে সবাই বাচাল হয়ে উঠল। শুধু এরফান চুপ। সকলে চ'লে গেলে পর মুখ তুলে বল্‌লে—"বাবু, এইবার মইরা যামু।"

দুদিনের দিন এরফান ম'রে গেল। ঘানি ঠেলতে ঠেলতে প'ড়ে গেল, পাহারা দুটো চড় চাপড় দিলে—"শালা ঢং দেখাতি আসিছ,

ওঠ্।" এরফান উঠল না। ওকে ধরাধরি ক'রে আবার হাসপাতালে তুলতে হোল, তার কয়েক ঘণ্টা পরে মাটিতে। একটা ঢংই দেখিয়ে দিল বটে এরফান।

এমন কতো হয়, প্রায় নিত্যিকার ঘটনা। কে দেখছে? এক জেল কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কেউ ফিরেও তাকায় না। তাদের দেখতে হয়, কারণ জেলে মৃত্যুর হার বাড়লে ওপর থেকে কৈফিয়ৎ তলব হয়। এরফানের টিকিট গেল। খালাসের তারিখ সামনেই। কয়দিনের রেমিশন আর খালাস লেখা হোল টিকিটে, মৃত্যুর কথা লেখা হোল না। কয়েদী খালাস গেছে, গিয়ে বাঁচল না মরল আমরা জানি না,—এই আর কি।

কয়েদীদের মধ্যেও একবার উঠল ওর কথা। মজ্‌লিস্‌-এ। বলতে পারো—পূর্ববংগ তৃতীয় বিভাগ কয়েদীসম্মেলন কিম্বা রসরাজ পাহারার সাদাপাতা পার্টি। বাঁ হাতের চেটোয় চূন আর তামাক পাতা ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডল্‌ছিল রসরাজ যেন রসভাণ্ডের অধীশ্বর। মধুলোভী ভৃংগের দল গুঞ্জন করতে করতে তাকে ঘিরে বসেছে। কেউ ডাকছে দাদা, কেউ চাচা জনান্তিকে বা সময়ান্তরে যারা শালা বা আরো কিছু বলে।

অছিমদ্দির বাড়ি বরিশাল। "বুড়াডার রকম ছাখ্‌লা? ফট্‌টরিয়া মরিয়া গেল? আরে দুধে পানি দেয় হেয়ার ডাগ্‌দরে কি করব? ম্যাটরে বলিয়া ছাখতি? রাস্থদা, এই বাইলে ডলান্‌ দাও, এই বাইলে।"

"হুন্‌স নি কথা! ছমৃদ্দির পুত রাস্থদারে ডলান শিখাইবার চায়। বরিশালের বুত, তামুক চোখে ছাখ্‌সস নি?"

পাঁচু নমোদাস কথাটা পড়তে দিল না। "হঃ। অলিচাচায় কইস একখান কথা। রাস্থদার হাতের তামুক,গালে দিলে য্যান মিছ্‌রির টুকরা।"

রসরাজ মৈমনসিং-এর আমদানী। "থোও থোও তুম্‌রার নসল্লা। হ। ম্যাটের কথা কী কইবার লইসিলা অসিমদ্দি বাই?"

"কমু আর কি? কী নসীবই আল্লায় দিসিল আম্‌রারে!"

রসরাজ অছিমদ্দিকে এড়িয়ে যেতে দিল না। "কইলা নসীব আর সারল। ওই যে কইবার লইলা ম্যাটের কথা, গণি,—হালায় চামার। কয়েদীর দুধ বেইচা হালায় ব্যাং-এর লাহান মুটা অইসে। হালা চুর। জাননি অলিচাচা! হালায় ধানচুরির আসামী ড্যাহাতির গপ্প মারে।"

অলিচাচা একটু ফ্যাসাদে প'ড়ে গেল। পরম স্নেহাস্পদ ভাতিজার হাতে মধুপর্ক। কিন্তু মেট গণির হাতে জানপ্রাণ এবং এই আড্‌ডায়ও তার দালাল আছে। কোনদিক সামলায় এখন? সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশে ঠিক এই সময়ে গণি এসে উপস্থিত। সবাই উস্‌খুস্ ক'রে উঠল। রসরাজ পূর্ববৎ।

গণি মাতব্‌বরি চালে বল্‌লে—"এই পাহারা, দিলারি গপ্প জমিয়ে বসেছিস্ দেবো হাজির ক'রে। ঘানি ঠেলার গতর, বেটা সিক্‌মানে ব'সে তামুক মারে আর দুধ খায়।"

সত্যি। রোগীর বরাদ্দ দুটীতেই খায়, এবং দুটীরই দেহ ব্যাং-এর মতো নধর টস্‌টসে। দুটীর জোগাড়ের পদ্ধতি কেবল আলাদা।

রসরাজ পাল্‌টা জবাব দিলে। "হাজির করবা? তুমার কাম না। ম্যাটুগিরি ভ্যাহাইবার আইও না এই হানে। হাটা দাও।"

গণি আমার শরণাপন্ন হোল। "দেখলেন সার ছোটলোকের আস্পর্ধা? এর পর যদি কেস্ ঠুকে দি বলুন কার দোষ? তোমার বিল্লা আমি ছুটিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।"

গণিকে তোয়াজ ক'রে ডাকলাম। "ছেড়ে দাও ওসব ছোটলোকের কথা, মরুক গে। হ্যাঁ, দেখ ভাই, মাছটাছ খাওয়াবে ত' একটু আদার

ঝোল ক'রে? তোমার বাবুকে কিন্তু বিশ্বাস নেই, তোমার ওপরই ভরসা।"

"বলেন কেন? শালা চামার। মায়াদয়া ব'লে কোন জিনিষ নেই। এই যে কয়েদীগুলো পোকামাকড়ের মতো মরে, ফিরে দেখে একবার? তবে আপনি ভাববেন না। আমি থাকতে আপনার সব ঠিক পাবেন।"

পাহারা রসরাজ কিসের জোরে যে মেট্ গণিকে চোখ রাঙায় তা আর যে না জানুক মেট জানে। কেন যে ঐ তাগড়া জোয়ান ঘানি না ঠেলে খৈনি ডলে আর হাসপাতালের দুধ খায় তাও গণির অজানা নয়। মাসে তিনটী টাকা গুনে দেয় ডাক্তারবাবুকে। তাঁর রিপোর্টে তাই দেখা যায়—"দেখতে জোয়ান হলে কি হবে, রসরাজ আসলে একটী রোগের বাসা। ভেতরটা একেবারে ফাঁপা জিরজিরে। ঘানিতে দিলে ও দেহ্ আর টিকবে না।" রসরাজ দুধের বদ্‌লি তামুক জোটায়, তামুকের বদ্‌লি বড় মণ্ডলি থেকে ফাইলের মাংস। গণির রাগের এও একটা কারণ, রসরাজ কেবল যে ছোট হয়ে মুখে মুখে জবাব দেয় তা নয়, ওর ব্যবসার আঁতঘাতও জানে এবং ওর প্রতিদ্বন্দ্বী।

ছোটলোকের দোষত্রুটী নিয়ে ঝগড়া করতে গেলে যে ভদ্রলোকের চলে না এ তত্ত্ব গণি সহজেই বুঝল এবং বিদায় হোল।

মেট জব্দ হওয়াতে সকলেই খুসী, তবে মনের ভাবটা খোলসা করতে পারছে না। ওর ভেতর অছিমদ্দি একেবারে সাদাসিদে এবং এরফানের মৃত্যুতে একটু আনমনা। কাছে এসে বসেছে বটে কিন্তু তামাকের ওপর খুব একটা টান নেই। ভবিষ্যত সম্বন্ধেও নিশ্চিত হয়ে গেছে, মরবেই,—গণিকে ভয় করলেও মরবে, না করলেও। বল্‌লে—"তোমার নি মায়াদয়া আছে, গণি ম্যাটের কিছু নাই। ছাও দেহি এক চিমটি, গালে দিয়া পরিয়া থাকি।"

"আল্লাহ্"

সকলে চম্‌কে তাকাল। পাশের বিছানায় ইয়াসিন দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে। অছিমদ্দির কথাগুলো শুনছিল। কংকালসার রুগ্নের মুখের ঐ শব্দটা ক্ষণেকের জন্যে ঘরের আবহাওয়াটাকে ভারি ক'রে দিল। শব্দটা ঢেউ তুলে তুলে সবার বুকের ঘাটে আছাড় খেতে লাগল।

ঘুরে গেল কথার মোড়। রসরাজ বল্‌লে—"বাবু কইস্থইন, তুম্‌বার হ্যাশে আর মানুষ রইতো না, ব্যবাক মইরা গ্যাল অইলে।"

রসরাজের চেটো থেকে তামুক তুলতে তুলতে পাঁচু বল্‌লে—"হ্যাশটা য্যাক্‌কেরে গ্যাল। মরবো না? নাওগুলি লইসে, জুয়ান ব্যাটাগুলিরে ড্যাহাত্তির ক্যাসে জ্যালে চালান দিসে, অহনে সরকারি দালালগুলাইন ধান কিনতে লইসে। জোর কইরা লইয়া যায়, বছরের ধানও ঘরে রাখতে দিবো না। আকাল লাগবো না?"

এস্তাজালি বল্‌লে কুমিল্লার খবর। "আরে তুমি কি খবর কও নমোর পো? ঐ যে কাচাবাইলের চৌদ্‌রিরা, বাগ্‌বিলার চরের দখল লইয়া আইকুটের মাম্‌লা কর্‌ছিল্, তেনাগোর ব্যাবাক জমিদারী মিলিটারিরা লইয়া সারসে। একখান ঘরও রাখ্‌সে না। মাইয়া-মানুষগুলাইনরে গোরাপল্‌টনের কাসে না রাইখ্যা ব্যাবাক মরদেরে খ্যাদাইয়া দিসে। বাবুগোর কি? মিলিটারির থনে ট্যাহা লইয়া সহরে ফুর্তি করে। কও চাইন্, ভিটা-বৌ ফেলাইয়া চাষীগিরস্তরা যায় কই? ইয়ার থনে মরসিল্ ত' বাল আসিল্। মান-ইজ্জৎ আর রইসে না।"

অলিচাচা বল্‌লে,—"রইবো কি? হ্যাশের থনে ইমান গ্যাসে কি মান-ইজ্জৎ গ্যাসে। ছাওয়ালটারে ইস্‌কুলে দিসিলাম। ম্যাট্রিক নি পাস দিসে আর সহর থনে আইয়া রোজানামাজ ছাড়ান দিল।"

রসরাজ প্রতিবাদ করল। "ইত্তান কিতা কও? আম্‌রার হিন্দুর গরে যে বাবুরা সন্ধ্যাপূজা ছাড়ান দিসে, বামুনের ফুলারা ধুতি ডুলাইয়া সহরে ফুরফুর কইরা ঘুইরা বেড়ায়, তেনাগো ত' দেহি মান ইজ্জৎ টাাহা-পয়সা হগলই আসে। তুমার ইমানডা কি ছুটলুকের লাইগা?"

এস্তাজালি শেষ চিম্‌টি ঠোঁটের নীচে গুঁজে দিয়ে বল্‌লে,—"ঠিক কইস রাসু বাই। আল্লায় গরীবেরে দ্যাহে না। আল্লার বিচার গ্যাসে।"

সবাই সায় দিল এই সিদ্ধান্তে। বুঝলাম আজকের কন্‌ফারেন্সে এইটেই রিজল্যুশন হোল, প্রপোজ্‌ড্‌ বাই রসরাজ সাপোর্টেড্‌ বাই এস্তাজালি। এমন সময়ে ইয়াসিনের বুক থেকে চাপা নিঃশ্বাস আবার বেরিয়ে এল—"আল্লাহ্‌"। থম্‌ থম্‌ ক'রে উঠল ঘর। দূরে সহর থেকে শোনা গেল আজানের ডাক। দু'চার জন উঠে গেল নমাজ পড়তে। রসরাজ বেরিয়ে পড়ল ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে। আমি খবরের কাগজে মন দিলাম। অনেক খবর,—"বাংলার অন্নসমস্যার সমাধান, খাদ্যমন্ত্রীর ঘোষণা।" "ভারতের অচল অবস্থার অবসান আসন্ন—লণ্ডনে নূতন বড়লাট ওয়াভেল কর্তৃক অতলান্তিক সনদের সমর্থন।" "চাংসায় চীনা বাহিনীর হাতে জাপসেনা নির্মূল।"

খবরের কাগজের দোষ কি? গোটা দুনিয়াটাই ঝুটা চটকদারি। মনোবিদ্‌রা বলেন মানুষের অভাব-অক্ষমতা-বোধ থেকে ঈশ্বরের কল্পনা এসেছে। অভাব-অক্ষমতা যতো বাড়ে, ততো ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়ে,

বিদ্রোহও বাড়ে, শেষ পর্যন্ত টেকে বিশ্বাসটা। জনতার ঈশ্বরবোধ আত্মবঞ্চনা, কিন্তু হতাশ-অক্ষমের ঈশ্বর-প্রতিবাদ ততোধিক আত্মবঞ্চনা। এমন কতো মিথ্যা আমাদের বাঁচবার তাগিদে সত্যি হয়ে গেছে। মিথ্যাকে না পেলে চলাই হতো দুষ্কর। একবার এক কাগজ-দিগ্‌গজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এতো মিছে কথা লেখেন কেন আপনারা? বল্‌লেন—"ওতে কী আসে যায়? সবাই ত' জানে। যদি কেউ বিশ্বাস করতো তবে বলতে পারতে।" বল্‌লাম—তবে লিখে লাভ? উত্তর দিলেন—এক নম্বর চাম্‌ড়া বাঁচানো অথবা অন্যান্য লেখার পাপ খণ্ডন করা। দু' নম্বর, লোকে মিথ্যে কথাও শুনতে চায়।

সত্যি, মনকে তোয়াজ করবার জন্যে প্রিয় মিথ্যার দরকার, মনের ঝাল মেটাবার জন্যে অপ্রিয় মিথ্যার দবকার। ইংরেজকে গালাগালি না দিলে দিনের ভাত হজম হয় না, যতোই না ইংরেজের দাসত্ব করি, যুদ্ধের ঠিকাদারি করি, কিম্বা জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারের দালালি করি। সস্তা স্বদেশীয়ানার তুবড়ি ছুড়বার জন্যে চাই রেডিওর মিথ্যা প্রচার, খবরের কাগজের মিথ্যা খবর, নইলে কি নিয়ে ইংরেজকে মিথ্যেবাদী বলবো? টিপ্পনিগুলোই বা ধারালো হবে কেন? সুরাবর্দীর খাদ্যবণ্টন, ওয়াভেলের ভারতপ্রীতি, চীনের জাপানবিজয়,—চা-এর টেবিলে ঝড় তুলতে হলে এমনি সব খবর চাই।

অপ্রিয় সত্যকে সর্বদা বর্জন করবে, আর মিথ্যা প্রিয় হলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে, এই নীতি শিখতে হলে জেলখানায় আসা দরকার। ছ'মাস অন্তর ইনস্‌পেক্‌টর-জেনারেল জেল পরিদর্শনে আসেন। জেল সাজিয়ে গুছিয়ে ফিট্‌ফাট্ করা হয়। সিপাই জমাদার অফিসার সবাই পুরোদস্তুর মিলিটারি সেজে তাঁকে দেখা দেয়। কয়েদী আর সিপাই সাহেবকে ফুলের মালা দিয়ে জয়ধ্বনি করে—"আই-জি সাহেবকি জয়।" জেল-পরিদর্শনের এই আদ্যোপান্ত মিথ্যাচারটুকু বুঝবার মতো

বুদ্ধি আই-জি সাহেবের অবশ্যিই আছে। তবু তিনি খুসী হন, কয়েদীকে রেমিশন দেন, সিপাইকে বক্‌শিষ দেন—অবশ্যি সরকারী তহবিল থেকে—জেলশাসন সম্বন্ধে ভালো রিপোর্ট দেন,—হয়ত' বা কারো খাঁ-সাহেব রায়সাহেব হবার সুবিধেও হয়।

আবার সাহেব আসবার সময় হয়েছে। সে উপলক্ষে মাঠচালির কয়েদীরা জেলের সবুজ জায়গাগুলো সাফ করছে। একদিন বৃষ্টি হয়ে ঘাস বেড়ে গেছে কোথাও কোথাও, তাই কাটিয়ে সমান করানো হচ্ছে। মনোবিজ্ঞান বলে পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ও সুশ্রীতায় অপরাধবৃত্তির শোধন হয়। বোধ হয় কয়েদীদের নৈতিক উন্নতির জন্যেই ঘাস-কাটা, সাজানো-গুছানো ইত্যাদির বন্দোবস্ত। একটু নির্ব্যক্তিকভাবে দেখলে তা নয়। এ রহস্যময়ী প্রকৃতির লীলা। দুষ্মন্তের আগমনের আগে কণ্বমুনির আশ্রম এমনি লীলায়িত হয়ে উঠেছিল।

আজও টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। ধুচনী মাথায় দিয়ে গুটিপাঁচসাত কয়েদী ঢেকিচালির মাঠে কাস্তে আর খুরপি চালাচ্ছে। একজন গলা ছেড়ে গান ধরেছে—কাস্তের টানে টানে তাল ফেলে। মাল্‌দ'র ছিরু মণ্ডল।

পরকীয়া তত্ত্বের গান। বউ-টীর ছেলে ঘুমুচ্ছে, সোয়ামীও ঘুমিয়েছে। টের পেল নাগর এসে বাইরে দাঁড়িয়ে। ঘুমপাড়ানী গানের ছলে নাগরকে ইসারা করছে।

টিপির টিপির জল পড়িছে বাইরে ভিজে কে?
বাড়ির পাছে মানের গাছ কাইটা মাথায় দে।
যাদু ঘুমা রে—
তোর বাপ ঘুমাইল।

বাইরে জলে ভিজ্‌ছ কেন? মানকচুর পাতা কেটে মাথায় দাও না। ভয় নেই, ছেলের বাপ ঘুমিয়েছে।

শিকার উপর দই-কাঁতারি তাইত' তুমি জানো
লুলুহা ডুইব্যা খাইও যাদু বিড়ালের নাম দিবো
যাদু... ....ঘুমাইল।

কাতারিতে দই আছে। ফুলো ডুবিয়ে খাও, বলবো বেড়ালে খেয়েছে।

তাকের উপর টিক্ তামাকু তাইত' তুমি জানো
খাটের নীচে গুড়গুড়ি হুক্কা জল ফেলিয়া টানো
যাদু... ... ...

কোটির উপর আছে হাঁড়ি তার উপরে নাড়ু
ননদের হাতে সৈরু শাখা আমার হাতে চান্ খাড়ু।
যাদু.... ....

ইদিক্-উদিক্ আছে খাট মধ্য খাটে আমি
ডাইনে আছে ছোট ননদ বাঁয়ে আছি আমি।
যাদু... ....

অন্ধকার ঘর ত'! খাট চিনে নিও। আবার যেন ননদের গায়ে হাত দিয়ে বোস না।

দিব্যি বউ-টী। শুধু বুদ্ধি নয়, বিবেচনাও আছে। সোয়ামীকে জানিয়ে কিছু করে না। শুধু শুধু কেন অনর্থ সৃষ্টি করা? আর জানলেই ত' মনোকষ্ট। যেখানে অজ্ঞতায় সোয়াস্তি সেখানে জ্ঞানী হওয়া বোকামি,—এ ত' আপ্তবাক্য। আর নাগরটীর ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে ত' কথাই নেই—"পরকীয়া রতি করহ আরতি সেই সে ভজন সার।"

যা বলছিলাম,—ছলনার কথা। জীবনযাত্রার প্রয়োজনে ছলনা সত্যি হয়ে যায়। বিজ্ঞান নাকি বিশ্বকেই জেনে ফেলেছে ছলনা ব'লে,—এর আর বস্তুত্ব নেই। এডিংটনের কথা। নাই বা থাকল। তা ব'লে কি বিশ্ব মিথ্যা?—বিশ্ব নেই? শংকর এই ছলনাকেই বলেছেন মায়া। 'মায়া'-কে 'মিথ্যা' বানিয়ে শংকরের অপব্যাখ্যা করেছে তার ভক্ত আর নিন্দুকেরা। সত্যকে আমরা নিজ নিজ রংএ রাঙিয়ে দেখি ব'লেই কি তা মিথ্যা হয়ে গেল? সত্য বা বস্তুরূপ আপেক্ষিক। ব্যক্তির আত্মকেন্দ্র থেকে প্রত্যক্ষ হয় যে সত্য বা বস্তুরূপ তাই মায়া। ব্যক্তিত্ব শেষ হয়ে গেলে মায়াও কেটে যায়। সত্য তখন অরূপ সত্তা। ছলনার (illusion) সংগে বাস্তবের (reality) বিরোধ আছে, সত্যের (truth) নেই। সত্য-ছলনাকে নিরাকরণ ক'রে দেওয়া অন্যায়, সমাজবিরুদ্ধ। ধর্ম, ঈশ্বর, ইত্যাদি সত্য-ছলনা। নাস্তিকদের একটা সমাজ কি চলতে পারে? ভল্‌তের জবাব দিয়েছিলেন,—"যদি তারা সবাই দার্শনিক হয়।" তা হয় না,—যতই বিজ্ঞান দিয়ে আর তর্ক ক'রে বোঝাও না কেন, বিধাতার মতো বিধিদাতা আর নেই। যতক্ষণ ধর্ম মানুষের বেদনায় শান্তি দেবে, সমাজে সাম্য ও শৃংখলার বিধি দেবে ততক্ষণ ধর্ম সত্য। যখন দেবে না,—তখন অসত্য, প্রবঞ্চনা। সত্য (truth) আর বাস্তব (reality) এক নয়, ছলনা (illusion) আর প্রবঞ্চনা (deception)ও এক নয়। ছলনা হলেই ধর্ম বর্জনীয় হয় না, প্রবঞ্চনা হলেই ধর্ম হয় অধর্ম ও অসত্য।

কে একজন বলেছিলেন—ঈশ্বর নেই এবং মেরী তার মা। কতো শিল্পীর কল্পনা অবাস্তব ঈশ্বরের স্বপ্নকে সত্য ক'রে তুলেছে মেরীর মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে। শিব ও সুন্দর মিলে হয় সত্য—হোক তা ছলনা, হোক তা অবাস্তব। সত্য ও বাস্তবের মধ্যে এই অর্থাপত্তির জন্যেই না বৈদিক দর্শন প্রতিষ্ঠা দিয়েছে 'ঋত'-কে!

আমাদের সমাজে অধর্ম ও অসত্যই ধর্মের নামে চলে। ধর্ম ও ও ঈশ্বর ব'লে যা চলে তা প্রবঞ্চনা—পিপাসায় শান্তিজল দেয় না, সাম্যের ব্যবস্থা দেয় না। এ প্রবঞ্চনা কতদূর নির্লজ্জ হতে পারে এখানে আছে তার দৃষ্টান্ত। সপ্তাহে একদিন পণ্ডিত আর মৌলবী আসেন কয়েদীদের ধর্মোপদেশ দিতে। উঠতে বসতে যাদের মনুষ্যত্বের অপমান, রোগ ও অখাদ্যে জীর্ণদেহ সেই লোকগুলোকে কী ধর্মশিক্ষা দেন তারা? চুরি করা হারাম, খুন ক'রে গুনাহ্ করেছো, নেশাভাংএর মতো বে'ইমানি আর নেই, এ সব ছেড়ে দেবে—বল খোদার কসম? খেতে না পেলে কি করবে তা কোন শাস্ত্রে লেখা নেই। চিত্তশুদ্ধির আগে পিত্তশুদ্ধি। শরিয়তের কথা হাদিশের নির্দেশ, চণ্ডীমাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের বাণী,—পিত্তি প'ড়ে গেলে কিছুই মনে থাকে না। লাভ মাত্র এই হয়—সবাই জানতো তারা কয়েদী, এ ছাড়া অন্য পরিচয় নেই। এতে জানল কয়েদী হিসেবে এক হলেও অন্যত্র তারা পৃথক,—হিন্দু ও মুসলমান।

এই পার্থক্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন ক'রে রাখবার জন্যে অন্য বন্দোবস্তও আছে,—রান্নায় স্বাতন্ত্র্য। মণ্ডলির লোক ভাত বিলি করতে এসে হাঁকে—"এই হিন্দু ভাত" কিম্বা "মুসলমান ভাত"। দীর্ঘ জেলজীবনে এমন কয়েদী চোখে পড়ে নি যে এই মহাতীর্থক্ষেত্রে বিধর্মীর হাতে খায় না। হাসপাতালের রান্নায় এবং পানীয় জল সরবরাহে জাতিভেদ নেই—এতেই তা বোঝা যায়। চোর-লম্পটের

জন্যেও ধর্মরক্ষার এমন পাকাপোক্ত ব্যবস্থা আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর ছাড়া আর কে রাখবেন ?

মার্ক্‌স্‌ বলেছেন ধর্ম জনতার আফিম। জেলে আফিমের নেশা মন্দ ছিল না। মুস্‌কিল এই যে ধর্মের নেশা আফিমের মতো ঝিম-মারানো নয়, উস্‌কে দেওয়া চেতিয়ে দেওয়া নেশা।

বুভুক্ষুকে দেখা দিতে হলে ঈশ্বরকেও নাকি আসতে হয় রুটি হয়ে। তেমনি যৌনভুখারীর কাছেও ঈশ্বর এলে তাকে আসতে হয় কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর রূপে। জেলের রুটি বিস্বাদ, লক্ষ্মী ত' নেই-ই, কাজেই ঈশ্বরকে আনতে হয় প্রবঞ্চকের বেশে। শিরাজি ছেলেটা মৌলবীকে বিদ্‌ঘুটে সব প্রশ্ন ক'রে বোকা বানিয়ে দেয়। "আল্লায় আশ্‌মান জমীন্‌ বানাইবার আগে কি আছিল হেয়া ত হাদিসে লেখ্‌ছে না।" "নামাজ পাঁচ-ওক্‌তা ক্যান্‌, দশ-ওক্‌তা পড়লে কি হয় ?" বিদ্যায় না কুলোলে মৌলবী সাহেব ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়েন,—"হজরত রসুলুল্লার ওপর কথা বোলো না বে-আদব।" শিরাজি ধর্মশিক্ষা নিয়ে ফিরে আসে। বেজার হয়ে ব'সে বলে—"কইতাম পারি না বাবু, রসুলের আছিল দশটা বিবি, তার উপুর দাসী বান্দী। আমার একখান বৌ, হ্যাশে ফালাইয়া থুইয়া বলদের লাহান পইরা আছি তিনটা বচ্ছর, হেয়ার মৌলবী কয় কি ? কন দেহি বাবু, বউ ছাড়া কি থাকন যায় ?"

কয়েদী-জীবনের মর্মান্তিক নির্যাতন এই যৌন-বুভুক্ষা। অসুখ নয়, অর্ধাহার নয়, মারপিট নয়, অতৃপ্ত স্ত্রী-সংগ। এতো যে অতিশ্রম, স্বাস্থ্য-হানি, নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তি, তবু অবসরমাত্র কৃমিপোকার মতো কিল্‌বিল্‌ ক'রে আসে আসংগ-চিন্তা। বিকৃত সম্ভোগে অর্ধতৃপ্তি লাভ ক'রে বিদায় নেয়,—নয়ত' অতৃপ্তির অভিশাপ রেখে যায় স্নায়ু-বিকার। শুধু সাধারণ কয়েদীদের কথা নয় আমাদেরও। আমাদের ভুলে থাকবার সুযোগ সুবিধে বেশী এই যা। শরীরের নাম মহাশয়,

যা সওয়াবে তাই সয়। একটী বিষয়ে মাত্র তিনি দুরাশয়। যদি জোর ক'রে সওয়াতে যাও তবে অন্যত্র প্রতিশোধ নেবে,—কম্‌প্লেক্‌স্‌-এর মারাত্মক এলেকা উন্মাদ-দশা পর্যন্ত। কামনার অতৃপ্তি দেহেমনে এনে দেয় অবসাদ। পরিশ্রমের ক্লান্তিকে ভয় নেই, ভয় অতৃপ্তির অবসাদকে।

কাজেই তাদের তারিফ করতে হয় যারা পাকেপ্রকারে যৌন-বৃত্তিকে যতটুকু সম্ভব মুক্ত ক'রে দেয়। শিরাজির ঐটুকু স্বীকারোক্তি ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো করবে। ছিরু মণ্ডলের গান তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো করবে। মেয়ে-কয়েদী আসছে শুনলে কয়েদীরা যে গেট্‌-এর দিকে জড়ো হয় এও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। ও গ্যাস যতো বেরিয়ে যায় ততই মংগল। কিন্তু বেশীর ভাগই বেরোয় না। তখন মুস্‌কিল হয় একটু তরুণ ও মেদমাংসযুক্ত কয়েদীদের। সৃষ্টিতত্ত্ব ও জৈব-প্রয়োজনের চেয়েও শিরাজির গুরুতর সমস্যা—বহু দাবীদারের মধ্যে কাকে দেবে তার অছিগিরি। দিলেই যে হাংগামা মেটে তাও নয়। অবশ্যি এ হক্‌ রসরাজেরই, কিন্তু খাটাতে গেলে পসার মাটি হয়। তার চেয়ে বুড়ো এরফানকে ভার দিয়ে দুষ্টু লোকের চুক্‌লি-কাটাও বন্ধ ছিল, বুড়োর হাত দিয়ে গাঁজা টানবারও সুবিধে ছিল। ও ম'রে রসরাজকে ফ্যাসাদে ফেলেছে—অমন বিশ্বাসী বুড়ো জোটানো ভার।

গ্যাস ছাড়বার আর একটা রাস্তা আদিরসের গান। ধন্য বাঁকুড়া-বীরভূমের ঝুমুর। রাজসাহীর আলকাপ, মালদ'র গম্ভীরা, মেদিনীপুরের তরজা, মৈমনসিংএর জারি, সব তার কাছে হার মেনেছে। নাচওয়ালী মেয়ের গান, এখানে গায় কাজওয়ালা পুরুষ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান গেয়ে ক্ষ্যাপা জানোয়ারকে শান্ত করে।

একদিন সোনা বাউরিকে পাকড়াও করলাম—ঝুমুর শোনাও। টান ধরল—"নারীদেহ সুমুন্দুর—

না বাবু হবেক নাই। উ গান খারাপ বটে।"

"গাও কেন্‌নে। কথা ত' গাঁইছ, কাজে কইরছ নাই। উয়াতে কি আছে?"

"না বাবু, তুমার কাছকে লাইবুব।"

কিছুতেই হোল না। দেহতত্ত্বের রসের ছিপি এক গেলাসের ইয়ার না হলে খোলা যায় না। যদি বসতে পারতাম ডোরাকাটা জাঙিয়া প'রে, কয়েদী-টুপি মাথায়, আর গামছা-পেটি খুলে বিড়ি-তামাক বাড়িয়ে—লাও সোনা ভাই, আরে ইধারকে ত' আস,—তা হলে আপনি বেরুতো নারী-দেহের যাবতীয় সংবাদ। যাক্, সোনা একটা ভদ্রগোছের পদ গাইল। সমুদ্দুর নয় দরিয়া—

অশোকপাতা কলমীর লতা মাঝ দরিয়ায় ভাসি লো।
এবার ম'রে সুতা হব
তাঁতিদেরও ঘরকে যাব
ছোট ছোট সেমিজ হয়ে তোদের বুকে থাকব লো।

ইন্‌ডোর গেট্-এর সামনে পার্কের মতো মরসুমী ফুলগাছে ঘেরা ছোট লন্-এ আই-জি সাহেব বসেছেন অফিসারদের নিয়ে। মাথায় বিরাট রংদার ছাতা, ফাইলের দিন সুপার সাহেব যেটা মাথায় দিয়ে আসেন। সিপাই-কয়েদীরা তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে বরণ করছে আর জিকির দিচ্ছে—আই-জি সাহেবকি জয়। হাসপাতালের কয়েদীরা সকলে এই মহোৎসবে যোগ দিতে গেছে। আমি একলা প'ড়ে আছি। ওদিকে ইয়াসিন মাঝে মাঝে আল্লা আল্লা করছে। আমার মাথায় কতকগুলো পোকা ঢুকেছে, কিছুতে যাচ্ছে না।

ইয়াসিন বোধ হয় সারবে না। পেটের ভেতর কোনো জায়গা পচতে সুরু করেছে—সারা গায় দুর্গন্ধ। ওই আল্‌লা শব্দটা ছাড়া আর কোন কথা ওর বেরোয় না। আজ যেন বিড় বিড় ক'রে কি বলছে। উঠে কাছে গেলাম। দেখি শিয়রে একজন ব'সে, তার সংগে কথা বলছে। ইয়াকুব মসলদার।

"তুমি যাও নি?"

যেন বেকুব ব'নে গেল। সেলাম দিয়ে সসংকোচে বল্‌লে—"হুজুর, ইয়াসিনকে গান বোলছি।"

"আই-জি সাহেবকি জয়"-এর জলসায় গিয়ে নাচগান দেখালে ইয়াকুব অনেকগুলি মার্কা পেতো। তা নয়, বোকাটা রোগজীর্ণ সহচরকে গান শোনাচ্ছে।

"হুজুর হুহার দিবেন? আমি গানটা বলি।"

শুধু বোকা নয়, পাগলও। যাহোক, পাগলের পাল্‌লায় প'ড়ে যদি রোগীর আল্‌লা আল্‌লা থামে আর আমার মাথার পোকা পালায় ত' বাঁচি। দিলাম হুহার। আসর অন্ধকার ব্যারাক, গায়ক ও নট মসলদার, হুহারী আমি, শ্রোতা ইয়াসিন।

ছিরু মণ্ডল বা সোনা বাউরি এরা সুকণ্ঠ এবং রসিক। বুড়া ইয়াকুব মসলদার কেবল রসিক নয়, শিল্পীও। কোমরে হাত দিয়ে পাছা দুলিয়ে গামছা নেড়ে নাচে, কিন্তু চোখদুটী দেখলে বোঝা যায় যে ও ভাবে মগ্ন হয়ে গেছে। ওর মুখে আদিরসের গানও মধুর লাগে। হাল্‌কা আমোদে তার শেষ হয় না।

মসলদার একটি আনন্দের ফোয়ারা—যেন আনাতোল ফ্রাঁস্‌-এর নৃত্যপরা 'ভাঙ্গ'। যেখানে আঘাত যেখানে বেদনা দেখবে তাকে নৃত্যচপল সংগীত-মুখর। ফরমাস ক'রে তাকে গাওয়াতে পারবে না,—কিন্তু হাসপাতালের রোগী যেখানে যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছে, মার

খেয়ে কয়েদী যেখানে একা একা ব'সে কাঁদছে, সেখানে সে তার শান্তির প্রলেপ নিয়ে অযাচিত উপস্থিত। মদকে মধুতে পরিবর্তন করবার ম্যাজিক সে জানে।

পুরুষ—আমি নতুন ব্যাপারি
খরিদ করি আম টুঁড়ে
আম টুঁড়ে বেড়াই
যত দাম লাগবে দিব তাই।

স্ত্রী— ওরে ফজলি আমের পাতল চোকা
রগে রগে ধরে পোকা
মোহনভোগের আম দেখতে বাঁকা
ধরতে পারলে হয় যত দাম দিব আমি তাই।

পুরুষ—ওরে চোর ওরে তোর নতুন গাছে
পা ফেলাব থাকে থাকে
দু হাতে দু ডাল ধরিয়ে গাছ বুকে
শাওন যে গাছ বুকে করি
তোর গাছে লাগাব তাড়ি
আমি সেরপুর থেইকে তাড়াতাড়ি
আইলাম তোমার বাড়ি
শাওন যে তোমার বাড়িতে
তোর গাছে তাড়ি লাগাইতে।

রসরাজ ঠোঁটের কোনে সয়তানি হাসি টেনে বলে—"শাওনের গাছে তাড়ি ত' লাগাইলা বুড়া, খাইল দেহি হিয়ালে—"। ব্যক্তিগত খোঁচা মসলদার অনায়াসে হজম করে। এই বাঁকা ইংগিতটা তার জীবনে অতি গূঢ় ও মর্মান্তিক সত্য। কিন্তু দুঃখকে সে বুকে নিয়েছে মন্দারমালার মতো, বেদনাকে নিসিক্ত করেছে রসে রাগে,—

স্ত্রী—হারে হায় ব্যাঙ্‌কে পুষলে পোষ মানে না হাতে মুতে
হাতে মুতে দেয়
ভানি সন কিসের কথা
ভানি সন কিসের কথা হয় ?

ব্যাঙ্‌ কে পুষলেও সে হাতের ওপর অপকর্ম করতে ছাড়ে না। স্ত্রীর মতে পুরুষ ব্যাঙ্‌ প্রকৃতির। সে ভানির প্রতি আসক্ত।

পুরুষ—ওরে এই শালি যে ওর দুলালী
আমাকে পাঠায় বড়ার বিলান
ঘরে ব'সে খায় লাগিয়ে হিলান।
দুহার—যা চইলা যা লাগল মজা বাহবা, বা-বা-বা।

পুরুষের মত অন্যরূপ। স্ত্রী তাকে বড়ার বিলান পাঠিয়ে স্বামীর ছোট ভাইর সংগে সংগসুখ উপভোগ করে।

স্ত্রী—(দেবরের প্রতি)
তোমার বড় ভাইর লাগে বইল্যাছে রাগে
গোসা হইও না।
বাড়িতে আসা যাওয়া বেড়ান ছাইড়ো না।

রসরাজ আবার ধরে ওকে চেপে।—"ছ্যাওরটা দিব্যি লায়েক দেহি। হালায় তর রকম, নারে ?" মসলদার ক্ষেপে উঠে বলে—"শালা আমি বুড়া হইছি না,—খাথ্‌ দাঁত পর্‌্যা গেছে।" আবার কোমর দুলে ওঠে। ঘরছাড়া বেপরোয়া বুড়া তার জীবন-সংগীতের বাকি পদ ক'টা গেয়ে দেয়।

এবারকার ক'রে দিলে তালকানা
হে ভোলা নানা।

তিন বিঘা মটর ছিল
এ ঝড়িতে উড়িয়ে নিল
রাখল না এক দানা
আবার ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে চল্যা গেলাম
বিড়ামপুর মরদানা।*

কয়েদীরা কোনদিন ভাবে নি যে তাদের গেঁয়ো গানের ও নোংরা গানের এমন সমঝদার মিলবে এই জেলখানায়। ঐ অশ্লীল মেঠো গান গেয়ে যে বিড়ি-তামাক পাওয়া যায় এও ওদের নতুন অভিজ্ঞতা। আমাকেও লোক-সংগীতের নেশা পেয়ে বসেছে,—শুনছি আর বেছে গুছে দু'চারটে তুলে রাখছি। বলা বাহুল্য যে বাংলার লোকগাথার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয় এগুলি, কয়েকটা মামুলি নমুনা মাত্র। এগুলি শুনে যে আনন্দ পেয়েছি আর ধৈর্য ধ'রে লিখেছি হয়ত' তার কারণ সংগীতের শিল্প-সম্পদ নয়। উঁচু দেওয়াল, অনির্দিষ্টকালের আটকদশা, নিঃসংগ ও নিষ্কর্ম জীবনে হতভাগা কয়েদীদের আত্মীয়বোধ,—এই সমস্ত পরিবেশে প'ড়ে গানগুলি রসপুষ্ট হয়ে উঠেছে। পায়েচলা পথের পাশে ঘাসের ফুল দেখতে ভালো,—বোঁটা ছিঁড়ে তুললে তার আর কী থাকে?

রাখহরি মোদক চেষ্টাচরিত্র ক'রে কামবিলাসী হয়ে এসেছে এখানে রংপুরের ভাওয়াইয়া আর চাপান শোনাবে ব'লে। তালাবন্ধ হতে হতে আদিরসের বান ডাকল।

* গানগুলির পরিচয় :—সুর—আলকাপ, গম্ভীরা। রচয়িতা—মকুর মোমিন, থানা—কালিয়াচক, গ্রাম—সেরসাহি, মালদহ।

স্ত্রী—ও চ্যাংড়া মইষাল রে
তোর জন্ত মন মোর সদাই রে ঝোরে। ,
মইষাল বাথান তোমার কোন চরে ?
পুরুষ—ও কন্তা বাথান হইল আমার বন্দিয়ার চরে
সন্ধ্যাবেলা আইসেন কন্তা আমার বাথানে।
স্ত্রী— ওরে আমরা হইলাম বেটী ছাওয়াল রে
ক্যামনে যাবো তোর বাথানে ?
পুরুষ—ও কন্তা বাড়ি হইল তোমার কোনখানে
সন্ধ্যাবেলায় যামু আমরা তোমার বাড়িতে।
স্ত্রী— ও বঁধু বাড়ি হইল আমার গাড়ার ভিটাতে
মার নাম হইল রতন চেড়ি বৌর নাম ফুলমালা।
পুরুষ—ও কন্তা থাকমু যাইয়া আমরা কোন খানে ?
সত্য করিয়া কন্তা কন আমারে।
স্ত্রী— আমার বাড়ির পাশে মালার তল
থাকেন যাইয়া সেথা দোনো ভাই
ও বঁধু সন্ধ্যাবেলায় যাইয়া আমরা যৈবন করব দান।*

বাহাদুর মেয়ে। বাৎস্যায়ন পড়া আছে নিশ্চই। রতিশাস্ত্রের পাঠ,—চোখে জল টেনে এগিয়ে যাও, তারপর পিছিয়ে এসে শিকার টেনে আনো নিজ খপ্পরে।

মসলদার চুপ ক'রে শুনল। শেষে ধমক দিল,—"ই কি গান বুলছিস বাবুর সামনে ? লজ্জা নাই তোর ?"

রাধহরি বললে—"আমি ত' লাজে মরি। বাবু যে শুনবার চান।"

---

* সুর ভাওয়াইয়া। রচয়িতা—সকেদ কুশারি (বৈরাগী)। গ্রাম—চাঁদেরখামার, কুড়িগ্রাম, রংপুর।

রসরাজ সালিসি করলে,—"আরে থো থো। চুরের লগে থাকতে থাকতে বাবুও চুর হইয়া গেসুইন। কি কন বাবু? হে-হে।"

বল্‌লাম—"বটেই ত', আমিও ত' চোর। চোর না হলে জেল খাটছি?"

জবাবটা রসরাজের পছন্দ হোল না।—"ইত্তান কিতা? আপনেরা হইলেন স্বদেশী। হ্যার লাইগা না বাবু কই। নাইলে ঐ হালায় হুনিল মাথ্‌ভর্‌,—ট্যাহা আর মাগি মাইরা জ্যালে আসছে, হ্যারে বাবু কয় কেডা? আইচ্ছা ল রাখ', বাবুরে রামায়ণের থনে একখান চাপান হুনা।"

রামায়ণ গানের ফাঁকে ফাঁকে যে পয়ার বা চুট্‌কি মস্‌করার গান গাওয়া হয় তাই নাকি রংপুরের চাপান। রাখহরি ধরল—

জামাই শাশুরী শুঁই নিড়ায়
টাপুর টুপুর ফাসুর ফুসুর কতই কথা হয়
একে ত' চ্যাংড়া জামাই নয়তন শাশুরী
মনে মনে মন মিলিয়া করছে পি-হ্‌-রি-হি-তি। *

"বাবু চোরের গান, আপনারে শুনাতে সত্যই লাজ লাগে।"

বুঝলাম দ্বিতীয় চাপানের ভূমিকা হচ্ছে। রামায়ণের পুণ্যকথা শুনতে শুনতে আমার চোখে ঘুম নেমে এসেছে, বল্‌লাম—"আচ্ছা আর থাক, শোও গে।"

রাতে একটা গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি দুই কয়েদী ঝগড়া লাগিয়েছে,—দুই গায়ক, স্বয়ং মোদক ও মসলদার। রসরাজ তাদের শাসন করতে ব্যস্ত।

মোদক বলছে—"শালা তুই এটার মধ্যে মুত্‌লি ক্যারে?"

---

* রচয়িতা—শ্যামানন্দ মোদক, চাঁদেরখামার, কুড়িগ্রাম।

মসলদার বলছে—"শালা তুই দুধ রাখার আর জায়গা পাইছিস না? ইটার মধ্যে কেউ দুধ রাখ্যা?"

ব্যাপারটা এই। মোদক কিছু দুধ চুরি ক'রে একটা ইউরিন্যাল-এ সেফ্ ডিপোজিট রেখেছে। মসলদার রাত্রে প্রকৃতির তাড়ায় উঠেছে, মোদকের খাটের নীচে ইউরিন্যালটা দেখে তাতেই কাজ সেরেছে। কাংস্যবিনিন্দিত আওয়াজ শুনে মোদক উঠেছে। কষ্টের রোজগার মাটি হোল দেখে রাগ সামলাতে পারছে না। রসরাজ মসলদারের পক্ষে, কারণ রাখহরি তাকে না জানিয়ে বি-কেলাসি করেছে, এ অপরাধের ক্ষমা নেই। বল্‌লে—"হালা রও। তুমারে কাইল হাজির করবাম, তুমার চাপান গানের ফাত্‌রামি ছুটাইয়া দিয়াম।"

আমি একটু নিদ্রাবিলাসী। আর সব সহ্য হয়, ঘুমের ব্যাঘাত সহ্য হয় না। মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গেল। পই পই ক'রে মানা করেছি ঘুমের পরে গণ্ডগোল করতে। গলা চড়িয়ে বল্‌লাম—"রসরাজ! যদি এখনি চুপ না করো তবে সব্‌বার নামে কাল খোদ সাহেবের কাছে রিপোর্ট করবো।"

সবাই থামল বটে কিন্তু রসরাজ একটু একটু গজ্‌রাতে লাগল। "বাবু, রাখহরি আপনারে দুধ খাওয়াইছিল্ আর বড় বড় কাঁচামরিচ খাওয়াইছিল্ না? কাইল ব্যাহানে ট্যার পাইবেন।"

ব্যাপার কি? কাল রাতে রাখহরি যত্ন ক'রে খাবার বেড়ে দিয়েছিল। তার যত্নটা মিষ্টি লেগেছিল বটে কিন্তু দুধটা লেগেছিল পান্‌সে। সম্ভবত আমার দুধ থেকেই সরিয়েছিল ওটা, তারপর জল মিশিয়ে বাকিটা আমাকে খাইয়েছে। কিন্তু রসরাজ কাঁচালংকার কথা বলে কেন? অর্শের রুগী আমি, রাখহরির কাছ থেকে কাঁচালংকা নিয়ে খেয়েছি, তাই রিপোর্ট করবে ব'লে ভয় দেখাচ্ছে নাকি? যাক্‌গে ঘুমুই। ইতিমধ্যে প্রভাতী ভৈরবীর ঐক্যতান বেজে উঠল—থক্-থক্-থক্।

হাসপাতালের কাসি, দূরে মস্‌জিদের আজান, বুটের খট্‌ খট্‌, তালার ঘট্‌ ঘট্‌, গুনতি, পঞ্চাশ জমা—ঠিক হায়, ভোর। ঘুম হোল না।

ডাক্তার রাউণ্ডে এলে পর রসরাজ রাখহরিকে টেনে নিয়ে এল। জাঙিয়ার পেছন দিক খুলে উপুর ক'রে হাঁটুর গুতো লাগাল। অল্পক্ষণ কস্‌রতের পর একটী নধর রক্তশ্যামলিম সুদৃশ্য সুদীর্ঘ কাঁচালংকা নিঃসৃত হোল। আমার ও ডাক্তারবাবুর সামনে সগর্বে সেটী তুলে ধ'রে রসরাজ বল্‌লে—"দেইখ্যা রাখেন হুজুর! হালারে হাজির করবাম।"

রাখহরি হাজির হোল, সাজাও পেল। কিন্তু আমার শাস্তির তুলনায় তা কতটুকু? লংকা দেখলেই মনে পড়ে 'চোরের লংকা' —আর তার চেয়েও ঝাল ও পোড়ানি কতকগুলি চাপা হাসি। কিছু শিক্ষা রসরাজকে দেওয়া দরকার। এ বিষয়ে সুনীলও একমত।

দিনকয়েক পর বিকেলবেলা বসেছি চা আর খবরের কাগজ নিয়ে। কাছে বসেছে যথারীতি রসরাজের সাদাপাতা-পার্টি। কাগজটা উল্‌টাতে উল্‌টাতে মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি এল। ইউরেকা,—ঠিক হয়েছে।

"দেখেছেন সুনীল বাবু? আসুন দিয়ে ফেলি দরখাস্ত।"

চোখ টিপলাম সুনীলকে। পেছনে কয়েকজোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি যে সজাগ হয়ে উঠেছে তাও বুঝলাম অনুমানে।

সুনীল উঠে এল। কাগজটা এমনভাবে তুলে ধরলাম যেন পেছন থেকে দেখা যায়।

"দেখুন।"

বেশ বড় একটা ছবি,—ব্যাণ্ডে তরুণীর দল। অপ্রতুল বেশের অন্তরাল থেকে বেহায়া যৌবন হাতছানি দিচ্ছে। নৃত্যতারকার শুচ্ছ আরামের কুঞ্জ ছেড়ে ফ্রণ্টে যাচ্ছে মিত্রসেনার চিত্তবিনোদন করতে। কাগজে তারই বিজ্ঞাপন—"জাতীয় সমর-মোহড়া"র নামে।

"পড়লেন ?"

"হাঁ, চমৎকার! দরখাস্ত দিলে হয়।"

"বিয়ে সম্পত্তি, খালাস সব এক ঢিলে। লড়াইতে যেতে হবে এই যা। তবে সবাই কি আর মরে? বেশীর ভাগই ত' জ্যান্ত ফিরে আসে।"

"ঠিক কথা। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষা ক'রে নেবে তো? আপনার আমার স্বাস্থ্যে কুলোবে?"

"তা ঠিক। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া যাক না দরখাস্ত। তারপর মঞ্জুর হ'য়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা হতে হতে ঢের সময় পাওয়া যাবে। এর মধ্যে দুধ মাছটা জুটিয়ে পুটিয়ে দেহটাকে তাগ্ড়া ক্'রে নেন।"

"বেশ আমি রাজি। ছেড়ে দিন দরখাস্ত।" কাগজ কলম নিয়ে তখনই দরখাস্তের মুসাবিদা করতে ব'সে গেলাম।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর একটা বই নিয়ে শুয়েছি, তখন অলিচাচা এসে কথাটা পাড়ল। "বাবু ঐ যে কাগজের ছবি লইয়া আপনেরা শলা করলেন হেইডা কিয়ের?"

তীর তাগমত লেগেছে। অলিচাচা রসরাজের দূত। আমি গা না লাগিয়ে বল্লাম—"ও তোমাদের কিছু নয়, আমাদের ঘরোয়া কথা।"

ইতিপূর্ব্বে কাগজটা অন্তর্ধান করেছে। অদূরে মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে রসরাজের দল বসেছে। মাঝখানে হারিকেন এবং তার সামনে একটা কিছু—নিশ্চয় কাগজের ছবির পাতাটা। পালের

গোদাটা নিশ্চয় ভাবছে ইংরেজী না শিখে কি ভুলটাই করেছি। ভগ্নদূতের রিপোর্ট শুনে কি যেন বল্‌ল—বোধ হয় এই ধরণের কিছু —"আমারও দরখাস্ত দেই, হেই ডরে কইতে চায় না। আচ্ছা রও, রসাও নাইপ্‌তার বাচ্চা।"

পরদিন থেকে লক্ষ্য করলাম আমাদের দুজনার ভোজ্যসম্ভার মানে ও পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করেছে। খাবারের থালায়, দুধের বাটিতে যেন এক সুনিপুন স্নেহস্পর্শ। সুনীলের সংগে প্ল্যান ঠিক ক'রে রাখলাম। সন্ধ্যার পর রসরাজ স্বয়ং সুনীলের কাছে উপস্থিত হোল।

সুনীল গম্ভীরভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্‌লে। তারপর জিজ্ঞাসা করল—"তুমি কি দরখাস্ত দিতে চাও?"

রসরাজ নিরাশক্ত ভাবে বল্‌লে—"হ্যাহ্‌, মাইয়ামানুষের লাইগা আর টান নাই। সম্পত্তির লোভও করি না। ভগবানের আশীর্বাদে জমিজমা যা আছে শাক-পান্থা চইলা যাইব। তবে খালাস যাইতাম চাই। হ্যার লাইগা বিয়া করন লাগে, করবাম।"

"কিন্তু যুদ্ধে ত' যেতে হবে।"

"যাইয়াম।"

"বুঝে দেখ। তোমার যা তাগদ দরখাস্ত দিলেই নির্ঘাত পাস হবে। তখন পেছপা হলে চলবে না। আমাদের পাস ক'রলেও হাতিয়ার দেবে না, পল্টনের দপ্তরে রাইটারের কাজ দেবে হয়ত'। তোমাকে বেওজর গোলাবারুদের সামনে ঠেলে দেবে। সেখান থেকে বেঁচে ফেরা মুস্কিল।"

রসরাজেরর মুখে সয়তানি হাসি খেলে গেল। "মাষ্‌ডর! বি-কেলাসি করি আর লড়াইর থনে পলাইতাম পারতাম না?"

"তা বটে। কিন্তু ঐ বিলিতি খৃষ্টান মাগিকে নিয়ে পারবে ঘর-সংসার করতে? জানই ত' ওদের না আছে জাতজন্ম না আছে ধর্মো।"

"অবোলা বেটি ছাওয়াল, বাইধ্য থাকে ত রাইখ্যাম, আর বাহত্রামি করে ত' খেদাইয়া দিয়াম। খেরেস্তানরার ঘরে না তালাক দেবার রেওয়াজ আছে?"

"তা হলে টাকাপয়সা ত' বেহাত হবেই, উল্টো খোরপোষ দেবার ধাক্কায় পড়বে।"

"তাইলে মুছুদ্দির হাটে একটা দোকান দিয়াম। দোকানডা আমার নামে লেইখ্যা নিয়াম।"

"তা যদি পারো ত' খুব ভালো, কোন ঝন্ঝাট থাকে না। তবে কিনা শোনা যায় যে মেমমাগীগুলোও কম বজ্জাত নয়। অতো সহজে সম্পত্তি হাতছাড়া করলে হয়।"

এবার রসরাজের চোখে অনংগের বাঁকা হাসি উথলে উঠল। "থোও থোও মাষ্‌ডর। হউক গা ম্যাম আর ড্যাম; একটা মাইয়া-মানুষেরে প্যারেম দিয়া ভুলাইতাম পারতাম না তো রসা মরদ হইছে ক্যার লাইগা?"

আর আর ছোটখাটো সমস্যাকে রসরাজ আমলই দিলে না। আগের বউর সংগে ঝগড়াঝাঁটি হলে কি করবে? মেম বউকে মানতে হবে বই কি। হাজার হোক রাজার জাতের মেয়ে। স্থির হোল সুনীল আমাকে বলবে, আমি রসরাজের জন্যে দরখাস্ত লিখে দেবো। কিন্তু জানাজানি না হয়,—তা হলে দরখাস্ত প'ড়ে যাবে অনেক, আমাদের ফস্‌কে যেতে পারে। দলের ভেতর একটু চাউড় হয়ে গেছে বটে, তা রসরাজ সামলে নেবে। সে অলিকে আর মসলদারকে বোঝালে—"তুম্‌রা বুড়া হইছ, তুম্‌রারে নিবো না।" এন্তাজ, পাঁচু এদের বল্লে—"তগোর শরীলে কুলাইতো না। মরদের লাহান শরীল হইতো, তো বাবুরডে কইয়া দরখাস্ত দিলাম অইলে।" তবু সবাই বিমর্ষ,—'সখি মন যে মানে না' ভাব। তখন রসরাজ মোক্ষম ধাপ্পা

মারলে। সাদাপাতার আড্‌ডায় ব'সে বোঝালে—অহনে বেহুদা দরখাস্ত দিয়া করবা কি? আমি আগে যাই, যাইয়া তুম্‌রার লাইগা ব্যবস্থা করাম। একটা ম্যাম্‌রে আমি জমাইয়া লই, দ্যাখ্‌বা কারুর দুঃখু রাইখ্যাম না।"

রসরাজের দেহে দিন দিন কান্তি ফুটছে। একটী সুপুষ্ট আমের বোঁটার দিকে যেমন সোনালী আভাস পড়ে পাকবার আগে। কাগজ এলেই চুপি চুপি এসে খোঁজ নেয় কোন খবর আছে কিনা। তালবাহানা ক'রে এড়িয়ে যাই। ঢের দরখাস্ত পড়েছে,—বাছতে সময় লাগছে,—এই সব। রসরাজের দৌলতে আরাম ক'রে দুধ মাছ খাচ্ছি আর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরমানন্দলাভ করছি। তৃতীয় আর ষষ্ঠ রিপু সমানে চরিতার্থ হচ্ছে। কিন্তু আর তো চলে না। এখন পালা সাংগ করি কেমন ক'রে? দৈবাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল। কারও কিছু করতে হোল না, রসরাজ নিজহাতে সমস্যার সমাধান ক'রে দিল।

সেদিন সকালে কয়েদীমহলে বেশ সোরগোল প'ড়ে গেল। ডাক্তারবাবু মেটদের ডেকে জানালেন—একজন মেমসাহেব এসেছেন লড়াইর সৈন্যদের জন্যে রক্ত নিতে। এতো তোলা রক্ত দিলে এতোদিন মিয়াদমকুব, এতোদিন কাজকামাই, এতোগুলো ক'রে বিড়িতামাক আর এতোখানি ক'রে মাছমাংস মিলবে। এতো লোভ দেখিয়েও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েদীরা রক্তের দাম বোঝে। ঐ ডাঁটাসেদ্ধ আর মাড়ি কাঁড়ি কাঁড়ি হজম হলেও একতোলা রক্ত হয় না, এ তারা জানে। ম্যালেরিয়া-যক্ষার বীজাণুতে ভরা সিফিলিস-গণোরিয়ায় বিষাক্ত রক্ত কোন দুর্ভাগাদের কাজে লাগবে কে জানে? কাফ্রি ও ভারতীয় সেনা ছাড়া আর কার?

ডাক্তারবাবু নাচার হয়ে আমার শরণাপন্ন হলেন। "দ্যাখেন,

অগো যদি একটু বুঝাইয়া পারেন। আপনেগো ত্মাশের কামেই তো। মিসেস ডোনাল্‌ড্‌সন আসছেন ন্তাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের থিকা।"

ত্মাশের কামেই বটে—জাতীয় সমর-মোহড়ার সাক্ষাৎ সমরলক্ষ্মী। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে ডাক্তারবাবু আবার বল্‌লেন—"দুইটা পাঁচটা হইলেই হয়। বোঝেন তো, আমাগো গরীবের হইছে মরণ। না হইলে রিপোর্ট যাইব, চাকরি লইয়া টানাটানি।"

খুব একটা কড়া কথা মুখে আসছিল, বাধা পেলাম। রসরাজ এগিয়ে এসেছে—"হুজুর! আমি রক্ত দিয়াম।"

ডাক্তারবাবু হাতে স্বর্গ পেলেন। "বাবা রাসু, আস আস। এত কয়েদী ঘাটলাম, রাসুর মত একটা মরদ দেখলাম না। আর কয়েক-জনরে লইয়া আস না ধন—তোমার তো মানুষজন আছে।"

"হুজুর, আমি দিয়া আই, হাসে মানুষজন পাঠাইতাম।"

বুঝলাম রসরাজ কিসের আমেজ পেয়েছে এবং কোথায় কোথায় তার সন্দেহ।

রসরাজের রসভংগ হোল যখন দেখল যে মেমসাহেবের বপু মোটেই খবরের কাগজের ছবির মতো নয়। দীর্ঘ পুরুষালি দেহ, পুরুষের পোষাক। তার নিষ্প্রভ অপ্রতিভ চেহারা দেখে মেমসাহেব ভরসা দিলেন—"কুছু ডর নাই, থোরা খুন লিবে সারিয়ে যাবে।" মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপর নিজহাতে রসরাজের ঠোঁটে সিগারেট পুরে ধরিয়ে দিলেন। মাথা ঘুরে গেল,—নিক না, যতো খুসী রক্ত নিক। মেমসাহেবের হাতের ছোঁওয়া, চৌদ্দপুরুষে মেলে নি, মিলবেও না।

ঐ তাগড়া জোয়ান, বিছানায় শয়ান হোল। কিন্তু তার হাল দেখেও কেউ দমল না। মেমসাহেব গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে দিচ্ছেন, হাওয়ার মত ছড়িয়ে গেল খবর। পোকা

যেমন ক'রে আগুনের দিকে ওড়ে তেমনি ক'রে রক্ত দিতে ছুটল কয়েদীরা। তাদের রক্ত দিয়ে দেশোদ্ধার কতদূর হোল জানি না। দেখলাম কাজ-কামাই এবং মাছমাংসের প্রতিশ্রুতিগুলো মিথ্যে এবং বাগানে, ঘানিতে, জলকলে, ঢেঁকিতে সর্বত্র দুর্ঘটনা সাধারণ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। রসরাজ আর সে মানুষ নেই। দীপ্তিহীন মুখ দেখে কষ্ট হয়। একদিন ওতে সাড়া জাগাবার জন্যে সুনীল বল্লে—

"শুনেছো? মেমসাহেব খবর পাঠিয়েছে যে তোমার রক্তই সবচেয়ে তাজা সাব্যস্ত হোল। তোমার টিকিট চেয়ে পাঠিয়েছে। বিয়ের দিন ঠিক হয়ে একেবারে খালাসের হুকুম চ'লে আসবে।"

অবিশ্বাস করল না। কিন্তু ঐ প্রস্তাবে উল্লসিত হবার মতো রক্তের জোরও ওর নেই আর।

সত্যিকারের বি-কেলাস গণিও নয়, রসরাজও নয়, ঢেকিচালির নতুন মেট আতাউর। কর্তৃপক্ষ বেছে বেছে ওকে ভিখনলালের জায়গায় বহাল করেছেন। কার টুপির ভাঁজে বিড়ি, কার গালের খোপরে সীসেগুলি কিম্বা পয়সা, কার মাথার চুল কদমছাঁটা না হয়ে সাত-আনা ন'-আনা, কিছু তাকে এড়িয়ে যাবার যো নেই। ধ'রে সটান কেস্-টেবিলে হাজির করে। কয়েদীর রেমিশন কাটা যায়, কিম্বা দোষ বুঝে রকমারি সাজা হয়—ঘানি, ডাণ্ডাবেড়ি, চটের জামা, শাস্তিখানা ইত্যাদি। এক একটা কেস ধরে আর আতাউর জাঁক করে—শালা আমার চোখকে ফাঁকি দেবে? তোর জন্মর থেকে জেল খাটছি, আমার ঘরবাড়ি জেল। কতো চোর বদমাস ঠিক ক'রে দিলুম।

কয়েদী ঠেঙানো, গোয়েন্দাগিরি, চুরি ক'রে দুধমাছ খাওয়া আর নেশাভাঙের ব্যবসা করা, এই আতাউরের কাজ। হাতে পায় খাটতে হয় না। কখনো সে দু'মাসের বেশী বাইরে থাকে না। নীড়াসক্ত জল-বিহংগ বার বার ফিরে আসে তার বাঁধা নীড়ে। আর কিছু না হলে ১০৯ ধারা, ১১০ ধারা আছে—যার মানে জীবন আজে জীবিকা নেই, চলাফেরা সন্দেহজনক। আরামের জায়গা। না-খেটে খাওয়া উপরন্তু প্রসার-প্রতিপত্তি, লোক-নির্যাতনের, চক্রান্তের জাল বুনবার এমন সুবিধে বাইরে কোথায়? ও বলে—"বাবু, জেল খেটে খেটে গায় খাটতে ভুলে গেছি। এখন আর কাজে কর্মে গতর বসে না। ঐ নিয়েই তো বউটার সংগে লাগল।"

"এবার কি কেস? কদ্দিনের সাজা?"

"বউটাকে খুন করেই তো এলুম। দেখলুম ও আপদ যাওয়াই ভালো।"

"আশ্চর্য! মেরে ফেল্‌লে? তোমার বউ ছেলে নিয়ে ঘর করতে সাধ হয় না?"

"সাধ করলে কি হয় বাবু? পুলিশ দেবে কেন? বিশ মাইলের মধ্যে চুরি ডাকাতি খুন দাংগা হ'লে ধ'রে চালান দেবে। মাগিটাকে কতো বল্‌লুম খুঁজেপেতে একটা নিকে ক'রে ফেল্। তা শুনবে না শুধু ঘরে ব'সে ব'সে কাঁদবে। বলুন ত' কি দিগ্‌দারি? এবার দিলুম চুকিয়ে। তুইও বাঁচলি, আমিও দশটা বছরের মতন নিশ্চিন্তি।"

"ছেলেমেয়েগুলোকে কি করলে?"

"ছেলেটা কোথায় পালিয়ে গেছে। মেয়েদুটোকে বেচে দিয়েছি। ঐ কটা টাকার জোরেই তো এখানে দিন চলছে বাবু।"

এরই নাম বি-কেলাস। পুলিশ যাকে শান্তিতে সংসার করতে দেয় না, জেল যাকে আলস্যের মধ্যে তিলে তিলে অকর্মণ্য ক'রে

তোলে, দুর্বলকে নির্যাতন করবার শিক্ষায় পারদর্শী ক'রে তোলে, মানবতার যা কিছু মাত্রা নিংড়ে ফেলে দেয়। জেল অপরাধী উৎপাদনের কারখানা, তার শিল্পসৌকর্যের পরাকাষ্ঠা বি-কেলাস কয়েদী।

মুখে এসে পড়ে—দয়ামায়া, ভালবাসা কিছু কি তোমার নেই ? বলি না। ঠিক জেনো যতো বড় পাষণ্ড হোক, ওসব সকলেরই থাকে, শুধু মাপকাঠি বদ্‌লে যায়। আতাউর সাধ্বী স্ত্রীর অন্নকষ্ট ও মনোকষ্ট দেখতে পারে নি ব'লে তার ভবযন্ত্রণা দূর করেছে। মেয়েদের অন্নের ব্যবস্থা ক'রে এসেছে তা যে উপায়েই হোক। তার কাছে বেঁচে থাকার নীতিটা মুখ্য, বাঁচবার উপায়টা গৌণ।

"বাবু ছি-ছেক্‌কার করছেন আমি জানি। কিন্তু বলুন ত', বাইরে খেটে খেতুম, দুবেলা ভাত জুটতো না, তার ওপর জমিদারের পেয়াদা, থানার চৌকিদার, মহাজনের তমস্সুক চারদিক থেকে উৎপাত করতো, বউর কান্না না হয় ছেড়েই দিলুম। আর এখানে খাটতে হয় না, দুধ-মাংস, নেশা-ভাংটাও জুটছে, বরং আরো আমিই জমিদার, দারোগা, মহাজন সব। বলুন তো কোন্‌টা ভালো ?"

বলবার কিছু নেই।

পঁচিশ বছর আগের কথা। তখন আতাউর জোয়ান চাষীর ছেলে। রঙিন চোখের রংএ সাকিনার চিকন গায় কোন বেহেস্ত-এর ঠিকানা পেল কে জানে ? সাকিনার বাপ কিন্তু রাজি নয়। তার হাতে ওর চেয়ে ভালো পাত্র আছে। আবু ব্যাপারির বয়েসটা একটু বেশি হলেও টাকাও অনেক বেশী। বেটীকে সুখে রাখবে, বাপও ফাঁকে পড়বে না। একদিন আতাউর সাকিনার বাপের সামনে ব্যাপারিকে মেরে পাট ক'রে দিলে, একটা হাত জন্মের মতন পংগু হয়ে গেল। ফৌজদারীতে আতাউরের সাজা হোল পাঁচ বছর। সাকিনা যে সে মেয়ে নয়—কেঁদে বাপকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—"বাপজান, দেখলে তো ওটা কি রকম

গুন্‌ডা? না পারে কি? ওর সংগে বিয়ে না দিলে যদি তোমাকেই খুন ক'রে ফেলে? তোমাকে মেরে ফেল্‌লে আমি আর বাঁচবো না. বাপজান।" বাপজান ভেবে দেখলেন মেয়ের আশংকাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আতাউর জেলে ব'সে সাকিনার চিঠি পেল সে বাপজানকে পাঠিয়েছে। পাঁচটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল।

খালাস হবার পর ওরা সাদি করল। কিন্তু মাস পাঁচছয় না যেতে একদিন আচম্‌কা পুলিস এসে বাড়ি চড়াও করল, ওকে চালান দিল পাশের এক থানায়। ডাকাতির মাম্‌লা। হাজতে দিনকয়েক কাটিয়ে আদালতে এসে বুঝল ব্যাপার কি। কেলো বাগ্‌দি ওর জেলের বন্ধু বি-কেলাস। সে হাকিমের সামনে একরার হোল—"হাঁ হুজুর, আতাউরও সাথে ছিল।" আতাউর ওর কানে কানে বল্‌লে—"জেল খাটবো পরোয়া করি না, কটা আর দিন। কিন্তু তোর ঘাড়টা ধড় থেকে না ছিঁড়ে বেরুবো না।"

কিন্তু তা আর হোল না। কেলো ওকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—"চটো কেন মিয়া সাব। তোমাকে আমি বি-কেলাসি শিখিয়ে দেবো। দেখবে কি মজা!" পুরু ডোরাকাটা বি-কেলাস পোষাকের সংগে আতাউর বি-কেলাসীতে দীক্ষা নিল।

তারপর বিশ বছর গেছে। সাকিনাকে খুন ক'রে মেয়ে বেচে এবার জেলে এসেছে।

দুটী তরুণ তরুণীর মধ্যে সাড়া দিয়েছিল আদি মানুষের বর্বর ভালবাসা। তাদের মিলনে পৃথিবীর মাটি মন্ত্র পড়েছিল, আকাশের আলো আশীর্বাদ করেছিল, মানুষ তাতে মাংগলিক সাজায় নি। আতাউরের মন থেকে মুছে গেছে সেই পুণ্য অনুষ্ঠানের স্মারক লিপি। অসাধ্য সাধন করেছে আমাদের পুলিশ, আদালত ও জেল।

Homo homini lupus—মানুষ মানুষের প্রতি নেকড়ে বাঘ। সত্যি কথা। কিন্তু কে তাকে নেকড়ে বাঘ বানায়?

বিশ নম্বর

দূর হোক। প'ড়ে মরুক সব। সুনীল লাবণ্য আর মোহিতের মাঝখানে প'ড়ে ছটফট করুক, রোগ-জরায় জীর্ণদেহ এরফান দুধ চেয়ে ঘানি টেনে মরুক, ডাক্তার-গণি-রসরাজ এ-কেলাসদের রক্ত চুষে দেহের কান্তি উজ্জ্বল করুক, মৌলবী সাহেব ক্ষুধাতুরকে আর কামাতুরকে ধর্মশিক্ষা দিন, মেমসায়েব আধমরা কয়েদীর যৌনবাসনায় সুড়সুড়ি দিয়ে 'দেশরক্ষা'র জন্যে রক্ত নিয়ে যান, জেল-কারখানায় গ্রামের চাষী থেকে বি-কেলাস অপরাধী তৈরী হোক,—কী যায় আসে? যদি এই নিয়ে মাথায় তাল পাকাতে বসি তা হলে মাথা আর তাল সামলাতে পারবে না। দর্শনের উর্ধ্বতম লোকে ছুটে পালাই। ষ্টোইক জেনো তাঁর ক্রীতদাসকে প্রহার করছেন। দাস বল্‌লে—"প্রভু! আপনারই দর্শনমতে মহাকালের নির্দেশে আমার অপরাধ ঘটেছে। আমি ত' দোষী নই।" জেনো নির্বিকার চিত্তে জবাব দিলেন—"সেই দর্শনমতেই মহাকালের নির্দেশে আমি তোমাকে পিটুছি।" সিলেনস্‌ মিডাস্‌-এর প্রশ্নের জবাবে বলছেন—"পরম সৌভাগ্য মানুষের একটাই আছে—না জন্মানো, না হওয়া। এ সৌভাগ্য মানুষের হাতে নেই, মন্দের ভালো হচ্ছে চটপট্‌ ম'রে যাওয়া।". আমাদের শ্রীকৃষ্ণ আরো ভালো বলেছেন—এদের ত' আমি আগে থেকেই মেরে রেখেছি—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব।" অতএব সব গোল্লায় যাক।

দর্শনের নেশা মাথা ঠাণ্ডা করে। তার অনুপান তারার দেয়ালী আর চায়ের পেয়ালা। কিন্তু মন কি পোষ মানে? অনন্ত তার পিপাসা, অনন্ত তার প্রসার-ধর্ম। দেহের রক্তে চিরিক দেয় কোথাকার এক অবাধ্য চঞ্চলতা। বলে কোথায় দেয়াল, কোথায় গরাদ? কোথাও বাধা নেই, উন্মুক্ত পথ প'ড়ে আছে, হাওয়ার মত ব'য়ে যাও, মেঘে মেঘে ডানা মেলে উড়ে যাও। দেহে মনে জোয়ার বেয়ে আসে শিশুর উচ্ছলতা। বয়সটা যেন বিশ বছর পিছিয়ে আসতে চায়। যৌবনের শীর্ষদেশ পার হয়ে এসেও ছোট ছেলের মতো দুষ্টুমি করতে সাধ হয়। কতবার যে হাত নিস্‌পিস্ করেছে ঐ শিমুল গাছটার মগ্‌ডালে চাপতে! জেলে গাছে চড়বার নিয়ম নেই। কতো চেষ্টা করলাম একটা লাট্টুর জন্যে। আজকাল বোধ হয় ছেলেরা আর লাট্টু খেলে না। মেকানো সেট্ বেরিয়েছে, শিক্ষা আর খেলা নাকি এক হয়ে গেছে। হায় রে লাট্টু,—ডাইভ্ বম্‌বারের মতন সাঁ ক'রে নেমে আসা, ট্যাংকের মতন ঠোকাঠুকি ক'রে লড়াই, শত্রুকে ঘেরাও ক'রে পাঁয়তাড়া, যেমন গতি তেমনি গর্জন—এ খেলা নেই আজকাল। মারবেল জোগাড় করলাম কিন্তু এমনি হাতের টিপ্ যে একটাও লাগে না। আর সমবয়সীই বা কোথায় পাই? সব ষোলর থেকে আশীর মধ্যে।

শেষে জুটল একটী। সিক্‌মান থেকে বিশ নম্বরে ফিরে এসে একটী সমবয়সী পেলাম। কিন্তু তার দাবীদার অনেক। কারণ সে ঠিক সমবয়সী নয়, সমবয়সিনী, এবং তার খেলার কায়দাকানুন একটু নতুন ধরণের। এতো উমেদার দেখে তার গুমোর বেড়ে গেছে। গরবিনীর মাটিতে পা পড়ে না। বিশ নম্বরের দু'জন ডিভিসন-টু রাজনৈতিক বন্দী আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন। মহাদেওপ্রসাদজীকে বেশী ভয় নেই। তাঁর বপু ও কণ্ঠে এমন একটা ভয়ঙ্করগম্ভীর দ্যোতনা আছে

যার পাল্লার মধ্যে পড়লেই খেলোয়াড়নী একটা বিচিত্র মুখভংগি ক'রে কিম্বা নাকিস্বরে 'খাঁ-ও' ব'লে পালিয়ে যায়। যায় আবার বনবিহারী বাবুর কাছে—রঙিনী তাঁর শয্যা-সংগিনী হয়, তুলতুলে গা ঘষতে থাকে বনবাবুর গায়। বনবাবুর সংগে ঝগড়াও হয় ভাবও হয়, খেলাটা তার সংগেই জমে। দুধ ঘুস দিয়ে দিয়ে মহাদেওজীর ভুঁড়ি চুপ্সে গেল তবু শ্রীমতী বিরূপ। দুধটুকু খেয়ে যা অনুগ্রহ করেন, তার বেশী নয়।

রাগ হয় বনবাবুর ওপর। মহাদেওজী বুঝলেন আমি তার ব্যথার ব্যথী। বল্লেন—"দেখিয়ে কিত্না দুধ পিলাতা, লেকিন হরগিজ্ আতী নহী। কেয়া বনবাবু মুঝ্সে খবসুরত হায়, বোলিয়ে না?"

"নহী জী। আপ্কা বদন তো সুরজ জৈসা হ্যায়, আঁখ জ্বল জাতা। আওর বনবাবু বিল্কুল লাক্ড়িকা মাফিক সুখা। আওরতকা দিল, কেয়া পতা? জানে দিজিয়ে।"

মহাদেওজী একটু ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—"এক রোজ মার দুঁ?"

ভয় পেয়ে গেলাম—"কিস্কো? বনবাবুকো?"

"আরে রাম রাম, কেয়া কহেঁ আপ? ওহ নিমক-হারামীকো।"

কেলেংকারির ব্যাপার। এই নিয়ে মারধোর হলে মুখ দেখানো যাবে না। সকলের মুখেই চুণকালি পড়বে। মহাদেওজী বুঝলেন। শেষে ভেবে ভেবে একটা ফন্দী বের করলেন।

ভয় নেই। শ্রীমতী খেলোয়াড়নী আর কেউ নয়, আমাদের মিনি।

সেদিন দেখি শ্রীমতীর সেই চটুল চাহনি আর লীলায়িত গতি কোথায় গেছে! ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেড়াচ্ছে,—চৌকা থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে দেয়ালতলা। ল্যাজে দড়িতে বাঁধা একটুকরো টিন, দৌড়ের সাথে সাথে ঠন ঠন্ ক'রে লাফাচ্ছে। শ্রীমতীর পায় যে এতো জোর তা আগে বোঝা যায় নি। এ ছন্দ ত' মন্দাক্রান্তা নয়, একেবারে

শার্দুল-বিক্রীড়িত। পেছন পেছন ভুড়ি টেনে ছুটছেন মহাদেওজী। প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবার কুটিল আনন্দ তাঁর মুখে-চোখে। আর কী অকৃতজ্ঞ পুরুষ জাত! কোথায় বনবাবু মহাদেওজীর সংগে হাতাহাতি বাঁধিয়ে দেবেন তা নয়, তিনিও বকের মতো পা ফেলে ফেলে ছুটছেন আর চিৎকার করছেন—"হ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা।" অম্বুজদা পর্যন্ত হঠযোগ ফেলে সিংহের মতো কেশরওলা মাথাটা ড্রেনের সংগে প্রায় ঠেকিয়ে বলছেন—"দেখে যান, দেখে যান, এই দিকে লুকিয়েছে।"

কিছুক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে মহাদেওজীর সেলে এসে দেখি মিনি এককোণে জড়সড় হয়ে ব'সে, গ্রহটী এখনো পুচ্ছদেশ ত্যাগ করে নি। নাকের দু'পাশে ঠোঁট দুটী যতদূর সম্ভব তুলে করুণ অনুনাসিক সুরে বল্লে—"মি-ই—আঁ-উ-উ"।

বনবাবু বল্লেন—"পণ্ডিতজী! বোলতী হায় কি মৈ আউঁ, অব্ ডোরী তো খুলো।"

কে জানতো যে এই আধবুড়োদের মধ্যে সেকালের দুষ্টু ছেলেটা লুকিয়ে আছে? জেলখানার বন্ধনে বয়সের নাগপাশ আল্গা হয়ে গেছে, চঞ্চল শিশু মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। সে না মানে বয়সের শাসন না মানে সামাজিক গণ্ডি। মহাদেওজী বাইরে যাবেন, আবার তাঁর বয়স ফিরে আসবে। তখন তাঁর ছেলে মিনির ল্যাজে টিন বাঁধলে তিনি হয়ত' দু' ঘা চড় কসিয়ে দেবেন।

বয়েস ও গণ্ডি যতো ভুলে থাকা যায় দীর্ঘ মিয়াদ ততো সহজে কাটে। তাই প্রত্যহ খুঁজে বের করতে হয় নতুন নতুন দুষ্টুমি, হাসির শিকার।

কিন্তু জীবনের এ বড় শোচনীয় প্রহসন যে হাসির সমাপ্তি হাসি দিয়ে হয় না। যিনি একটী মৃত শাবক প্রসব করেছিল। পশুমাতা আমাদের অপরাধ টের না পেয়ে আমাদেরই কাছে ব্যাকুল মিনতি জানাচ্ছিল—"দেখো না বাছার কি হোল, কেন নড়ে না?" মানুষকে পশু এমন ক'রে লজ্জা দিতে পারে তা জানতাম না আগে।

তবু ভুলে থাকতে হয়। জোর ক'রে হাসা আমাদের ধর্ম।

রাতে দু' ঘণ্টা অন্তর সিপাইদের ডিউটি বদ্‌লায়। ফী বারে নেড়ে দেখে সেল্-এর তালা ঠিক আছে কিনা, আর ডেকে দেখে কয়েদী জ্যান্ত আছে কিনা। প্রথমে—"এই জোয়ান, এই জোয়ান," সাড়া না পেলে এই শালা, শূয়ার-বাচ্চা।" শ্বশুর-পুত্র প্রীতি-সম্ভাষণে অর্ধ-চৈতন্য হয়ে সাড়া দেয়। সে আওয়াজে জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও সিপাই'র দেওয়া পিতৃ-পরিচয় খণ্ডিত হয় না। শ্বশুরের পুত্রবিয়োগ হয়নি জেনে সিপাই পাশের সেল-এ জামাতার কর্তব্য সাধন করতে যায়।

রাত একটা। ডাকতে হয় নি, তালা নড়তেই ঝুরণ শেখ হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠেছে। সিপাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভরসা দিচ্ছে—"আরে কা ভইল্? জীন পিরেত নহী। আদ্‌মী ব। সিপাহী।"

সতেরো নম্বর সেল থেকে ডিভিসন-টু কয়েদী মৌলবী-সাহেব বল্‌লেন—"কেয়া জী, রোতা কেঁও, মর গিয়া?"

"নেহী জী। জিন্দা হায়, আওর মুর্দাসা চিল্লাতা হায়।"

কাজেই ওর জিন্দ্‌গী সম্বন্ধে আশ্বস্ত না হয়ে ছাপ্‌রার সুরজবন্‌স্ সিং যায় কি ক'রে?

কিন্তু সিপাই ভুল করে নি। ঝুরণ শেখ জীবন্মৃত হয়েই আছে।

বিশ নম্বর ইয়ার্ডে ডিভিসন-টু কয়েদীদের হেঁসেল বা চৌকা। যে ক'টী ফালতু এখানে কাজ করে তার মধ্যে ঝুরণ একেবারে মূর্খ,

আনকোরা এ-কেলাস। জেলের বর্ণবিভাগে ও হরিজন—কারণ কয়েদীদের ধারণা ও ছিঁচ্‌কে চোর। সরকার নাকি অকারণ অনুগ্রহ ক'রে ওকে খাস-কৌলীন্যে তুলে দিয়েছে—সিঁধেল চুরি নয়, ডাকাতি-রাহাজানি নয়, মেয়েচুরি বৌ-ভাগানো নয়, একেবারে খুনী মামলার আসামী! কথা উঠলে ঝুরণ লজ্জায় ম'রে যায়—যেন আমি ত' নিজেকে বিদ্বান বলছি না, কিন্তু ডিগ্রী দিয়ে দিলে কি করবো?

চৌকার ফাল্‌তুগুলো অষ্টপ্রহর ওর পেছনে লেগে আছে। বনবাবু সেদিন একটা ইংরিজি লেখা কাগজে ওর টিপ্‌সই নিয়েছেন। পরদিন তালা খুলতেই ঝুরণ শেখ আমার পা জড়িয়ে ধরেছে,—"আমাকে বাঁচান বাবু!"

সনাতন গায়েন, নিধু বৈরাগী, নাদির মহম্মদ, সবগুলি এসে জড়ো হয়েছে। চাপা হাসিতে মুখচোখ ভেঙে পড়ছে। কতো ক'রে শুধাই আরে হোল কি?—কে শোনে! সনাতন মেট চোখ লাল ক'রে ধমক দিচ্ছে—ছাড়্‌ বাবুর পা, বেরো বলছি! কে শোনে!

মহাদেওজী তাঁর সেল থেকে হাঁক দিলেন—"এ ঝুরণ, গোর মৎ ছোড়'। বাবুজী তুম্‌কো জরুর বচায়েংগে।"

চোখ টিপে সনাতন সুরু করল—"শোনেন বাবু, বলি তবে। মৌলবী সাহেব ওর একটা সম্বন্ধ করেছেন, এই জেলারই মেয়ে, বিধবা। মোহরাণার বয়েসও কিছু নয়, এই চল্লিশ-টেক। ওর চেয়ে মোটে বছর আটেকের বড়—"

ঝুরণ হঠাৎ পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল,—"না—না, আমি বিয়া করবো না। আমার বউ আছে।"

"চোপ হারামজাদা! আচ্ছা বাবুই বিচার করুন এই দুর্দিনে মোহরাণার পাঁচটা ছেলেমেয়ে আর জমিজমা কে দেখাশোনা করে? বিয়ে করলে তোরও কিছু সম্পত্তি হয়, ওদেরও একটা অভিভাবক হয়।"

"না-না, আমি বিয়া করবো না। আমার বউ আছে।"

পরিহাসটা নির্দয় হলেও নির্দোষ। যোগ দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। "নাই বা করলে বিয়ে, নিকা করতে পারো ত'।"

কপট উত্তেজনা দেখিয়ে নাদির বল্‌লে—"তবে কাগজ সই করলি ক্যান্? আম্‌রা সাক্ষী হইয়া টিপ্ দিলাম, এতক্ষণে হাকিমের কাছে কাগজ চইলা গ্যাছে। তর লাইগা অহনে জ্যাল খাটুম নি হগলতে?"

"তাই ত'! এই সব ফেরেশ্‌তারা জেল খাটবে? বলত' কী অন্যায়!"

"আমাকে বাঁচান বাবু। আমাকে মিছা কথা ব'লে টিপ্ নিয়েছে।"

মৌলবী সাহেব এলেন। লম্বা দাড়ির ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে গম্ভীর মুখে বল্‌লেন—"এটা কি ঠিক হচ্ছে ঝুরণ! সে বেচারীকে আশা দিয়ে—? আচ্ছা একবার দেখতে চাও, তা না হয় বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

একটা পথ পাওয়া গেল। বল্‌লাম,—"সেই ভালো। মেয়ে দেখো না, তাতে দোষ কি? পছন্দ না হয়, তখন দেখা যাবে হাকিমের কাছে ভালো ক'রে আর একটা দরখাস্ত লিখে মাপ পাওয়া যায় কি না।"

কিন্তু ঝুরণকে নোয়ানো গেল না। "না বাবু, আমি মেইয়া দেখবো না।"

"এ তোমার বাড়াবাড়ি। সে বেচারীর কী কসুর যে তুমি তাকে দেখবেও না?"

"তবে জবান দেন, বিয়া করতে হবে না?"

"সে কি আমি পারি রে বোকা? আমি পারি গুছিয়ে হাকিমকে একটা দরখাস্ত লিখে দিতে। কিন্তু মেয়ে দেখে তোমার ত' পছন্দও হয়ে যেতে পারে।"

মৌলবী সাহেব বল্‌লেন—"বেশ। জেনানা ফাটকে মেয়ে আনাবার বন্দোবস্ত করি।" ব'লে চ'লে গেলেন।

নতুন একটা কৌতুকের ইংগিত পেয়ে সবগুলো ওকে চেপে ধরল,—ছাখ্‌ বাবু সব দিক বিচার ক'রে রায় দিয়েছেন। যদি আর একটাও কথা বলিস্‌, এক্ষুনি মেয়ে এনে জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দেবো।"

আশ্রয়প্রার্থী অসহায় হরিণশিশুর মতো ভয়ার্ত্ত চোখদুটী আবার মিনতিতে ভেঙে পড়ল। না, এ শিকারী পশুর খেলা আর নয়। সকলকে ধমক দিয়ে বিদায় করলাম। বসলাম ওকে নিয়ে।

"তোমার কোন ভয় নেই ঝুরণ। বল ত' বিয়ে করতে চাও না কেন?"

তখনো সন্দেহ যায় নি। "বাবু আমার পক্ষে আছেন?"

"নিশ্চই। কিন্তু গোঁ ধরলে ত' হবে না। আইনের ফাঁক বুঝে দরখাস্ত দিতে হবে ত'।"

আইন-আদালতের নামে বোকারও বুদ্ধি খোলে। বল্‌লে—"আমার শ্বশুরের সম্পত্তি পাবো বাবু, বিয়া করলে দিবে না। দেন না লিখে।"

"শ্বশুর না মরলে ত' পাচ্ছ না। এ মেয়েরও জমিজমা আছে, বিয়ের সাথে সাথে পাচ্ছো।"

বুদ্ধিটা কাজে লাগল না দেখে ঝুরণ একেবারে সব খুলে দিল। যেন—এতই যদি নির্লজ্জ তোমরা, কি দেখতে চাও দেখো।

"ও মেইয়া খুব ভালো বাবু। বাপের জমি আছে তবু আমারে নেক্‌-নজরে দেখে। আসতে যাইতে গায় পাও লাগলে সালাম দেয়। আমার সাজা হইল,—বইসে আছে, তালাক দেয় নাই, বদ্‌ লোকের সংগেও যায় নাই। হাজত থিকে যাবার সময় কান্‌তে কান্‌তে বল্‌ল—তুমি ফিরে আসলে ঘর করব।"

"না হয় দুজনকে নিয়েই ঘর করলে?"

"না বাবু, পরির কাছে পরের বউ পরের বেটা নিয়া যাইতে পারবো না।"

টপ্ টপ্ ক'রে চোখের জল ঝ'রে পড়ল পায়ের ওপর। গলাটাও ভিজে গেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। হায় কয়েদীর দুরাশা! পরি পথ চেয়ে থাকবে, ঝুরণ ফিরে আসবে, কিন্তু ঘর কি ব'সে থাকবে ওদের জন্যে?

"কাল সারারাত ভাবনায় আমার ঘুম হয় নাই। বাবু আমাকে বাঁচান।"

"কোন ভাবনা নেই ঝুরণ, আমি ঠিক দরখাস্ত লিখে দেবো। হাকিমের মাপ হয়ে যাবে।"

কিন্তু বাংলাদেশের পরম গণ্ডমূর্খও হাকিম নামক দেবতাকে চেনে। তাই মধ্যরাত্রে তালা নাড়ার আওয়াজ শুনে পত্নীবিধুর কয়েদী ভেবেছে বুঝি চৌকিদারই এল, সংগে সমন আর পাঁচ ছেলের মা মোহরাণী। সুরজবন্স্ ধম্কাচ্ছে—"হেই শালা চুপ রও।" আর ঝুরণ আপত্তি করছে—"না-না—আমি বিয়া করব না।"

এমনি ক'রে মিশে থাকে হাসি আর কান্না। কান্নার ভেতর খুঁজে নিতে হয় হাসিকে। আবার হাসির সাধ্য নেই কান্নাকে এড়িয়ে যাওয়া। রসরাজ মিনি ঝুরণ সকলের কাছে ঘা খেয়ে ফিরে আসে তামাসা আর দুষ্টুমি। যেমন এখন জেলখানায় বসন্তকাল আর কাল-বসন্ত এক সংগে এসেছে। কালবসন্ত থাক, আমরা বসন্তকালকে চাই।

সেলগুলোর পেছনে চৌকা, স্নানের ফাইল ও পাইখানা। তার মাঝে মাঝে ছটাক তিনেক জায়গা। সেখানে ডিভিসন-টু কয়েদীরা গাছ লাগিয়েছেন। রুচির বৈচিত্র্য আছে। পেঁপে, তুলো, গোলাপ, ধনেশাক, ইত্যাদি মিলে উদ্ভিদ্‌জগতের একটা আন্তর্জাতিক। সবুজ ছোপে ছোপে বসন্তের আঁক পড়েছে। গাছগুলোয় নতুন পাতা, তাদের তলে দু-চার গাছি দুর্বাও গজিয়েছে। ছক্কু হাড়িকে নিয়ে মৌলবী সাহেব এই বাগানের তদারক করেন। দুজনেই সমান পটু, যেন ডন্ কুইক্‌সোট আর স্যাংকো পাঞ্জা। গোলাপ গাছগুলি অজস্র ফুল দেয় কিন্তু দুষ্টব্যাধিগ্রস্তা প্রসূতির সন্তানের মতো বিকৃতাংগ। পেঁপে গাছগুলি অতিরিক্ত জলসেচনে স্থূলাংগিনী বন্ধ্যা। বেগুন গাছে পোকা ধরে, ফলগুলি মুকুলে কুঁক্‌ড়ে যায়। মৌলবী সাহেব ছক্কু হাড়িকে নিয়ে নিষ্ঠাবান পতির মতো গাছগুলির সেবা করেন। ফল ফুল যেমনি হোক, নতুন পাতায় গাছের বাহার খুলেছে, ওদের দেখে বুঝতে পারছি জেলে বসন্তকাল এসেছে।

কদিন যাবত শোনা যাচ্ছে বাইরে হিন্দুস্থানী সিপাইদের আসর-জমানো গান। আজ দোল। উঁকি-মেরে-দেখা আকাশ আর চুরি-ক'রে-ঢোকা বাতাস চুপি চুপি ব'লে যায় ফাগুয়ার খবর।

তিন ছটাক জমির বাগানে ব'সে আছি আমরা, ভাবছি ফাগুয়ার কথা। বনবাবু আর মৌলবী সাহেব এমন চৌদ্দটী বসন্ত পার করেছেন। মহাদেওজীর মাত্র দ্বিতীয় এবং এই শেষ, তাই একটু আনমনা। বোধ হয় ভাবিজীর কথা মনে পড়েছে। আমিও বিমর্ষ। বললাম—"স্বদেশী করার ঠেলাটা টের পাচ্ছি বনবাবু,

লড়াই ক'রে আশ মিটেছে মিঞা
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া—"

বনবাবু পাদপূরণ করতে যাচ্ছিলেন,—"হোরি খেলব আমরা—"

গেল আট্‌কে। বল্‌লেন,—"কবিগুলোর ঐ ত' দোষ। মেয়েছেলে ছাড়া লিখতে পারে না।"

মহাদেওজী প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন—আওরৎ বাদ দিয়ে কবিতা হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনে আমরা তর্ক শুনতে প্রস্তুত নই। আজ মলয় বাতাসে নব কিসলয়ের উৎসবে শুধু না-বলা কথার গুঞ্জন। মৌলবী সাহেব মহাদেওজীকে কুঁড়িশুদ্ধ একগোছা গোলাপ ভেঙে উপহার দিলেন। বিবর্ণ ফুলগুলিতে বোধ করি আবিরের লালিমা লেগেছে—যেন রুগ্নার গণ্ডে প্রেমিকের চুম্বন। মৌলবী সাহেব গোড়া খুঁড়ে নতুন সার দিচ্ছেন, হয়ত' আগামী বৎসর ফুলগুলি হবে স্বাস্থ্যে উজ্জ্বলতর। বেগুনগাছের পাতার ওপর একটা সবুজপোকা গুট গুট ক'রে হেঁটে যাচ্ছিল—মৌলবীসাহেব টোকা দিয়ে ফেলে দিলেন, মাটি চাপা দিয়ে সার বানালেন।

পেঁপে গাছটার ওপর একটা দাঁড়কাক অনেকক্ষণ ধ'রে ডাকছে। ঠোঁট বাঁকিয়ে গলা ফুলিয়ে ডাকছে কা-কা, গলার নীচে পালকগুলো ফুলে উঠছে। চোখদুটো ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের মতো পরিস্কার,—সত্যিই কাকচক্ষু। তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখি শ্রীমতী মিনি একটা আধমরা ইঁদুরছানা নিয়ে খেলছে শিকারীর খেলা। লাস্যময়ী হিংসা,—কে বলবে সোহাগ নয়। তার মুখ লাল। কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখলাম রক্ত নয় আবির। কোন কয়েদীর বুকে জমা রং পাত্রের অভাবে ওর গালে উপ্‌চে পড়েছে। শিকারিণী মিনির গালের ঐ আবিরটুকু আজকের দোলের সাক্ষী।

টিনের মগ নিয়ে পাইখানায় গেলাম। দরজার ওপর থেকে বাইরে দেখা যায়। পেঁপেগাছের মাথায় দাঁড়কাকটার ধৈর্যের অন্ত নেই। মিনির প্রসাদের আশায় তখনো গলা ফুলিয়ে ডাকছে ক-অ, ক-অ-অ। ঝট্‌ করে এক টুকরো ঝড় তীরের মতো এসে লোভের সামগ্রীটী তুলে নিল, একটা চিল। দাঁড়কাকটা দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করতে করতে

তার পেছনে ছুটল, আর মিনি আবির-মাখানো মুখ তুলে বোকার মতো তাকিয়ে রইল। গুন গুন ক'রে একটা কলি গেয়ে ফেল্‌লাম,—স্থান আর পাত্র ভুলে গেলাম, মনে রইল শুধু কাল,—

"আজ বসন্ত ডাক দিল যে অনন্ত আনন্দে।"

দুত্তোর! ভাবতে ভাবতে আসল কাজই হোল না। জল ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ছক্কু হাড়ি চটপট টুকরিগুলো বের ক'রে নিচ্ছে আর গন্ গন্ করছে—"বাবুগুলোর কিছু হয় টয় না, শুধু শুধু জল ফেলে আমার কাজ বাড়াবেক।"

কে বলে কাকের ডাকে ছন্দ নেই? দুপুরের নিথরতা ভেঙে সেল-ঘেরা উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে উড়ে যায় ছন্দে বাঁধা কলাপ,—কা-কা-আ-আ, কা-ক্কা-আ-আ। কি বলে? কৈ কৈ? কে? কেন ডাক? না আরো কিছু?

এই সেলের পরিবেশে, ছন্নছাড়া হতভাগা কয়েদীদলের মধ্যে প্রাচীর-নেপথ্য হতে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশখণ্ডে সঞ্চরমান একটানা কাকের ডাকের মতো স্বরমাধুর্য আর কিছুতে নেই। ছেলেবয়সে দেশের গাঁয়ে থাকতে কোকিলের ডাকে ঘুম ভাংতো, আমবাগানের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে ফিরতাম স্বপ্নস্বননা বন-মায়াবিনীকে। চোখের আশা মিটতো না, কিন্তু কান ভ'রে থাকতো নাতিশীত-প্রত্যুষে ঘন-পত্রচ্ছায়ে কুহকিনী কুহরিনীর কণ্ঠমদিরা। বসন্তের পর গ্রীষ্ম এসেছিল। প্রত্যন্তের উষর প্রান্তরে নির্বাসিত অন্তরীণ জীবনে শুনেছি চিলের শীষ—অনলবর্ষী আকাশ আর তাপদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে একটা কম্পমান

বিদ্যুত প্রবাহের মতো,—তন্ময় হয়ে শুনেছি প্রান্তরের অন্তরমথিত সেই ধ্বনি। আর আজ শীতান্তের অবসন্ন দুপুরে কাকের টানা টানা ডাক,—পাথরের ঘের ফুটো ক'রে লোহার গরাদে জলতরংগ বাজিয়ে একটা হাহাকার ফোয়ারার মতো ছিট্‌কে উঠেছে; কারার মর্মোত্থিত আকুতি।

জাফর আলির দেশ থেকে মানুষ এসেছিল। অনেকদিন পরে আপন জনের সংগে দেখা। চৌকার বারান্দায় ব'সে গল্প করছিল দেশের গাঁয়ের কথা, ভাইবোনের কথা। ভরা দুপুর। এক স্তূপ এঁটো বাসন প'ড়ে আছে। বেলা গড়িয়ে যায়, কারো হুস্‌ নেই। নিধু বৈরাগীর তিন কুলে কেউ নেই। সবাইকে মনমরা দেখে সে নিজেই বসল বাসনের গাদা নিয়ে। মল্‌তে মল্‌তে গান ধরল—

বিভ্যাশেতে জনম যে গ্যাল
আমার ভ্যাশে যাওয়া হইল না।

দূর আকাশপ্রান্ত থেকে প্রতিধ্বনি এল—কা-কৃকা-আ-আ-আ। কৈ-কৈ? কে-কে?

কৈ? কে? কেউ তো নেই। সেলের দরজা দিয়ে দেয়াল-পারের শুক্‌নো নিমগাছটা দেখা যায়। ঐখান থেকে কাকের ডাক আসছে। ভরা দুপুরে এ যেন নিশির ডাক, বিদেহী ক্ষুধার কান্না। জীবন কেটে গেল বিদেশে শুধু নয়, জেলে। দেশে যাওয়া হোল না। কোথায় দেশ? কে আছে দেশে? কেউ নেই। তবু সে খোঁজ অবান্তর। দেশের মাটি মনকে টানে। দেশে যার কেউ নেই তার আবার দেশবিদেশ কি? যার প্রাণে কোনদিন গাঁট বাঁধল না তার আবার দেশবিদেশ কি? সে আবার দেশের মায়ায় ভোলে কেন? নীড়ভাঙা বিহংগের মতো স্থিতিহীন দিক্‌হারা যাত্রী সে, হাওয়ার মতো প্রাণ তার অনন্তবিসারী ভূমার দিশারী, কারো কাছে ধরা দেয় না. কোথাও বাঁধা পড়ে না।

তা হয় না, হয় না। প্রাণ ঘরছাড়া বেদুইন নয়, মুক্তপক্ষ বলাকা নয়। নীড় ভাঙে কিন্তু ভাঙা নীড়ের মোহ যায় না। নীড়বাসীকে আকাশ টানে, আকাশচারীকে নীড় টানে। কূলহীন নীলপারাবারে দাঁড় টেনে টেনে শিথিল হয়ে যায় বাহু। প্রাণ আশ্রয় চায়।

হর কিসিসে দিল মিলানা
ইয় তুমারা কাম নহী হায়।

হিন্দুস্থানী দরজাওলা পাহারা গাইছে। সবাইকে ভালবাসা, সবাইকে আপন করা—বৃথা চেষ্টা। প্রাণ একাশ্রয়ী একচারী।

তবে কেন রক্তকমল ধুলায় ফেলে এলাম? যারা ফুলডালি নিয়ে এসেছিল কেন তাদের হেলায় ফিরিয়ে দিলাম? একজনকে ঢেলে দেওয়া মর্মের মধুনৈবিদ্য—কিছু কি মূল্য ছিল না তার? এ কি আত্মনিপীড়নের মোহ? নিজেকে বঞ্চিত ক'রে ক'রে আঘাত হেনে হেনে কী সুখ? সুখী ভোগী আত্মপরদের শিক্ষা দেওয়া?—না বাঁধাঘরের ছন্দহীন জীবনযাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণা?

আর কিছু নয়—এ আত্মনিগ্রহ বৈদগ্ধ্যের দান, মনীষার অভিশাপ। অসত্যের জ্বলনে যে দগ্ধ সেই বিদগ্ধ। মনন ও মমতা যার আছে সেই মনীষী। জীবনের মাটি থেকে মিথ্যার মোহমুক্তি যার মূল উপড়ে ফেলেছে সেই সত্যার্থীর মনে শান্তি কোথায়? জীবন-ভর অসত্যের জ্বালায় শপেনহয়ের নীরবে কাঁদলেন, বললেন—মনীষীর মতো দুঃখী আর নেই। তীব্র মনীষার পীড়ণে বুদ্ধি হারিয়ে নীট্‌শে বললেন—বুঝতে পেরেছি জীবের মধ্যে শুধু মানুষ কেন হাসতে পারে, তার যাতনা ভুলবার জন্যে তাকে হাসতে হয়। বৈদগ্ধ্য আত্মঘাতী। রাজ্যের বেদনাকে সে ডেকে আনে, তাতে রিক্ততা ভরে না। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

তাই সব ছেড়ে ছিন্নকণ্ঠী নিধু বৈরাগীর মতন মন 'দেশে'র দিকে ফিরে ফিরে যায়। মাটির দেশের দিকে নয়,—স্মৃতিঘেরা, অতীতের ছায়াঘেরা, মায়াপুরীর দিকে। ছিন্নদল শতদল সহস্র দল মেলে ডাকে আয় আয় ফিরে আয়। কাক ডাকে কা-কৃকা-আ, কা-কৃকা আ,—কৈ-কৈ? নেই নেই।

একখণ্ড মেঘের ছোঁওয়ায় দুপুরের রোদ ঝিমিয়ে পড়ে। কাকের ডাকে সুর মিলিয়ে আবার আসে এক জেলপাখির গান,—

জীবনে যারে তুমি দিলে না মালা
মরণে তারে কেন দিতে এলে ফুল।

অনেকদিন পরের কথা। যাতায়াতের গণ্ডি ছোট হয়ে গেছে। হাসপাতাল, ঢেকিচালির মাঠ, মাঝের পার্কটা এবং আরো অনেক জায়গা এখন নিষিদ্ধ দেশ। একমাত্র সিক্যুরিটি নম্বরের পথ খোলা। যাই না ওদিকে। সমুদ্রবিহার যদি নাই হয়, তরি বানে ভাসাবো না। বিশ নম্বরে নোঙর ফেলে আছি।

বড় একা হয়ে গেছি। মহাদেওজী খালাস গেলেন। বনবাবু ও মৌলবী সাহেব চালান গেলেন। অম্বুজদা সিক্যুরিটি নম্বরে চ'লে গেলেন। শেষে বিশ নম্বর থেকে ডিভিসন-টুর চৌকা উঠল। সনাতন গায়েন, নাদির মহম্মদ, ঝুরণ শেখ, নিধু বৈরাগী, জাফর আলি সবাই ফাইলে চ'লে গেল। জেলিমাছ ডাঙায় ফেলে তীর থেকে লোণা জল নেমে গেল।

লোণাজলের একটি জীব রয়ে গেল চরে আমার সংগে। সবাই

যেদিন চ'লে যায়, মিনি মিউ মিউ করতে করতে ছুটে এল। আমার গা ঘেঁষে গোল হয়ে মুখ তুলে বল্লে,—আমি আছি কিন্তু।

একটী সাথী নিয়ে দিন কাটে।

পদ্মার পারে কোন গাঁও থেকে রাত দশটার পর শোনা যায় গুণাই বিবির পালা গান। বরিশালের এক অখ্যাত লোককবির গীতিনাট্য, যাযাবরের মতো পথ চলতে চলতে এসেছে উত্তর বাংলায়। সারা জেল যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন নিস্তরংগ মৌন অন্ধকারের মধ্যে একটা খরগতি তরণীর মতো ভেসে আসে বিধুরা গ্রাম্য-বালিকার করুণ বিলাপ। গুণাই বিবি ও তোতামিঞা—এদের সোনার ঘর ভেঙে দিল হুলু মিঞা,—গুণাইর রূপমুগ্ধ তোতার কাকা। মিথ্যে চক্রান্ত ক'রে তোতাকে হুলু জেলে পাঠাল। গুণাই নিরালায় ব'সে কাঁদে, কদমডালে কোকিল ডাকে, গুণাই ধমক দেয়। এমন সময়ে হুলু এসে করে বিয়ের প্রস্তাব। গুণাইর বীণায় গর্জে ওঠে দীপক,—কাকা হয়ে যদি এ কথা বলতে পারো তা হলে নিজ মেয়ে স্বরূপজানকে সাদি করো গিয়ে। কাকাজানের নির্লজ্জ কামনা শান্ত হয় না। বধূ জীবন বিসর্জন দিল। রূপের আগুন নিভে গেল, জ্বলে রইল প্রেমের একটী অম্লান স্বর্ণশিখা।

ছিল কি বরিশালের চাষীঘরে এক লুক্রেশিয়া বা কৃষ্ণকুমারী,—পুরুষের লালসাকে যে দিয়ে গেছে চরম দণ্ড ও অনন্ত কালের অভিশাপ? আর এই স্তব্ধ নিশীথে কারাপারে পদ্মার চরে সেই মহিমান্বিতা কি নেমে এসেছে দরদী শিল্পীর সংগীতের লয়ে লয়ে পা ফেলে—বীণাবাদিনী, সপ্তস্বরেশ্বরী?

এমনি কাব্য রচনা হতে পারতো জাফরকে নিয়েও। তার মধ্যে আছে সে শ্রী ও শুচিতা যা কাব্যের সম্পদের চেয়ে বেশী,—ঐশ্বর্য।

রোগা ফরসা চেহারা জাফর আলির। বছর বাইশ-তেইশ বয়েস।

কয়েদীদের মধ্যেও এমন নম্র ও কর্মঠ ছেলে কম দেখা যায়। জেলখানার প্রত্যেকটী আইন মেনে চলতো, চৌকার কাজে কখনো ফাঁকি দিতো না, বিড়ি-তামাকটী পর্যন্ত খেতো না, লজ্জা ও বিনয়ে মাথাটী ঈষৎ নত ক'রে কথা বলতো। বাঁধ কাটার দাংগায় ও আর ওর বাবা একসংগে জেলে এসেছে। নীচু জমিনের বাসিন্দারা বানের জল ঠেকাবার জন্যে বাঁধ বেঁধে দেয়। তাতে উঁচু জমিন ভেসে যায় ব'লে সেখানকার বাসিন্দারা বাঁধ কেটে দেয়। এই নিয়ে হাজারো লোক মিলে দাংগা করে, কিছু খুন-জখম হয়। জাফর এবং ওর বাবা এই রকম একটা কেসের আসামী।

একটা বিষয়ে জাফর জেল আইনের খেলাপ করতো। যখন তখন জারি গাইতো।—

হায়রে কাল নিয়ার (?) মেঘে করল অন্ধকার
দৃষ্টি নাইগো তারা নাইগো কেমনে হব পার
বলো কেমনে হব পার
পার কর হে নবি সাহেব না জানি সাঁতার।

একবার সিপাই রিপোর্ট ক'রে দেয়। কেস-টেবিল হোল এবং কয়েকদিনের রেমিশন কাটা গেল। টিকিটটা নিয়ে এল—"বাবু, কদ্দিনের মার্কা কাটলো?"

"কী আর? মোটে সাত দিনের।"

"না বাবু, সাত দিনে কিছু না। আমার ন-ক্যাসটা গেল।"

'নো কেস্'—কয়েদীর সারা বছরে কোন কেস্ হয়নি, এই সুনামটা এবং তার দরুণ আই-জি রেমিশনটা কাটা গেল বলে জাফরের দুঃখু।

তবু জাফর ঐ জারিগান না গেয়ে পারতো না। তার এতো আইন-পরতন্ত্র মন কখন যে উদাসী হয়ে নিয়ার মেঘে অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যে পাড়ি জমাতো তা টের পেতো না সে, অজানিতে হয়ে যেতো

কাজ ও আইনের ব্যতিক্রম। কবি ও ভক্তের মতো উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী যে আর নেই তার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত এই স্বভাববাধ্য জাফর আলি।

গান গাওয়া বে-আইনী, বিড়ি-তামাক বে-আইনী, খেলা-নাচা বে-আইনী, চুল ছোট বড় ছাঁটা বে-আইনী, মাথায় টুপী কোমরে গামছা ঠিকমতো না থাকলে বে-আইনী, স্নান করতে গিয়ে মাপা জলের এক বাটি বেশী গায় ঢাললে বে-আইনী। কতো রকমের বে-আইনী কাজ যে আছে জেলখানায়! কোন কোন কাজ আইন-সংগত তার হিসেবই বরং সহজ। অবশ্যি সব আইনই সবাই মানছে না, এবং সব বে-আইনী কাজ নিয়ে কেস্‌ও হচ্ছে না। সিপাই রিপোর্ট করতো না যদি জাফর সময়মতো তাকে দেখে তটস্থ হয়ে গান থামাতো। জাফর তাকে দেখতে পায় নি এতে তার সম্মানে লেগেছে।

এই সামান্য ব্যাপারটা তার পরে ভুলে গেছি। রোজা এসেছে, যারা রোজা পালন করে সূর্যাস্তের পর তাদের পাওরুটি হালুয়া ও সামান্য একটু মিষ্টি দেবার বন্দোবস্ত আছে। জাফর সারাদিন নিষ্ঠার সহিত উপবাস করেছে, অথচ খাটনির কামাই নেই। উপবাসের পর পারণ করবার জন্যে অন্যান্য রোজাব্রতীদের সংগে খাবার নিয়ে আসে। একদিন দেখি সেই সিপাই যে জাফরের নামে রিপোর্ট করেছিল,—একটা ঠোঙায় খাবার বাঁধছে। আধখানা রুটি হালুয়া ও বুঁদে। চৌকার কয়েদীদের খাওয়া লক্ষ্য ক'রে জানলাম ও খাবার জাফরের। ভাবলাম এ অত্যাচার উপেক্ষা করা উচিত নয়, সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ডাকলাম জাফরকে।

"তোমার কোন ভয় নেই। কোন সাজা না হয় আমি দেখবো। আমি এখনি বড় জমাদারকে ডেকে সিপাইকে মালসমেত ধরিয়ে দিচ্ছি।"

"বাবু রোজার দিনে আমার হারাম করবেন ?"

"হারাম! তোমাদের শরিয়তে কি এই জুলুম বরদাস্ত করতে বলেছে ?"

"জুলুম কিয়ের বাবু? জাকাৎ দিছি। কোরাণ শরিফে ছুরা বক্‌রায় কইছে রোজা পারণ করবার আগে জাকাৎ সদ্‌কা দিবা, নাইলে হারাম হইব।"

"ও জবরদস্তি নিচ্ছে। তুমি আমাকে জাকাৎ দিলে না কেন ?"

জাফর হাসল। "আপনে ত' বালবাসেন। আপনেরডা কত সময়ে নিছি, আপনেরে দিলে ত' জাকাৎ হইল না। রসুলে কইছে রোজার দিন কারুর লগে দুষমণি রাখবা না, আর গরীবেরে জাকাৎ দিবা। সিপাইবাবুর চাইর-পাঁচটা ছাওয়াল, খাওয়ার দিতে পারে না। আর সেই যে আমার ক্যাস্ করছিল, মনে একটু গোসা ছিল হ্যার লাইগা তারে রোজার কয়দিন জাকাৎ দেই।

আমার শিক্ষা-অভিমানী মাথা নিরক্ষর কয়েদীর কাছে নীচু হয়ে গেল। এমনি আলেম ছিল জাফর আলি।

যেদিন ওরা চ'লে যায় জাফর ব্যস্ততায় চৌকার এক কোনে ওর ছোট্‌টো পুঁটুলিটা ফেলে গিয়েছিল। খুলে দেখি এক টুক্‌রো সাবান, একটা ভাঙা চিরুণী, একটা ছোট শিশিতে বাতের তেল ওর বাবার জন্যে, আর একটা চিঠি পোষ্টকার্ডে লেখা। চিঠিটা পড়বার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

এলাহি ভরসা

তারিখ

মান্যবরেষু, ১৫।৬।৫১

আচ্ছালাম আলায়কোম পর সমাচার এই যে ভাই আপনার হাতের একখানা পত্র পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি যাহা হউক ভাই

আমরা খোদার ফজলে সকলে ভাল আছি এবং আমার চাচাত ভাইগন ভাল আছে এই যে ভাই আমাদের রাঙাচুরিয়ার চর উত্তরে কোনা নদিয়ে ভাঙ্গিয়া আকবর মণ্ডলের বাড়ি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু ভাই দুঃখে আমার দিন কাটাইতে হইবে এবং পিতার জন্য ভাইর জন্য আমরা সদাসর্ব্বদা 'কাঁদিয়া দিন কাঁটাইতেছি এবং যেদিন খোদা তোমাদিকে বাড়িতে আনিবেন সেদিন খোদা আমাদিকে শান্ত করিবেন এবং বাবাজান কেমন আছেন তাহার সংবাদ জানাইবেন কারুন তাহার হাতের দুইখানা পত্র পাইয়াছি কারুণ এই পত্র পাওয়া মাত্র বাবাজানকে বলিবেন সত্বর একখানা পত্র দিয়া আমাদিকে সুখী করিবেন ইতি আরজ—

ঠিকানা :	মোঃ জাহেদ আলী মণ্ডল
জাফর আলী মণ্ডল	সাং পানাকুড় চর
সাং......সেণ্ট্রল জেল	পোঃ পোটল
নং 9517	জেলা ময়মনসিংহ

রাঙাচুরিয়ার চর। নদীর ভাঙনে ভেসে গেল চাষীর জমিজমা। সংসারের ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে কিশোর গিরস্ত দূর কারাবাসী পিতার ও ভ্রাতার পথপানে চেয়ে আছে। "পিতার জন্য ভাইর জন্য আমরা সদাসর্বদা কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছি।" চর ও নদীর দেশে মা ও ছেলে নীরবে অশ্রু ফেলে। বহু দূরে পাঁচিল ও গরাদের আড়ালে বাপ ও বড় ছেলে নিরানন্দ পরিশ্রমে দেহপাত করে,—অশ্রুপাতের সময় পায় না। বাংলাদেশের কয়েদী।

পাশাপাশি আর একটা ছবি। এও বাংলাদেশের। অশীতিপ্রায় বৃদ্ধ কমল সরকার স্বদেশী বক্তৃতা ক'রে গুরুদণ্ড ভোগ করছেন। ডিভিসন-টু হয়ে আছেন অন্য খাতায়। তাঁর অন্তরের তিক্ততা ও আগুন ধারালো রসনা থেকে গখুরা বিষের মতো উপ্‌ছে পড়তো। সবাই বলে 'দাদু'। প্রীতি-সম্ভাষণ শুনে তিনি স্বরচিত কবিতা শোনাতে আসেন। পকেট থেকে খাতা বেরোবার আগেই শ্রোতা পালায়।

আমার মতো দু'চারজন যারা তাঁর পাগলামি বরদাস্ত করতো, তিনি কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে তাদের কাছে আসতেন। প্রথমেই—

বংগ জননীর উজল রতন তোরা আঁধারে রহিলি ঢাকা
বিদেশী দলিত মায়ের চরণে রহিলি জনম বাঁধা।

স্বদেশীদের গুণকীর্তন ও বিদেশীদের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার শেষ হলে হাসি-তামাসা চলতো। অবশ্যি এক একটি মন্তব্যের ব্যাখ্যারূপে এক একটি সুদীর্ঘ কবিতা না শুনে নিস্তার ছিল না। তারপর খালাসের দিন নিয়ে আলোচনা,—দাদু বেরিয়ে গিয়ে কী করবেন। নানান্ রকমের প্ল্যান বলেন। বলতে বলতে হঠাৎ হাস্যোজ্জ্বল মুখ মলিন হয়ে আসে। নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে ব'লে বসেন,—"তোর মতো একটা ছেলে যদি আমার থাকতো?"

"সে কি দাদু, আপনার মতো ভাগ্যবান পিতা ক'জন আছে? এমন ছাত্ররঞ্জন প্রফেসর, সুরসিক কথাশিল্পী—"

দাদুর চোখে জল দেখে কথা বেধে যায়। কাঁদতে কাঁদতে বলেন বিগত কথা। ছেলেকে যত্নে মানুষ করলেন, সহধর্মিনী চ'লে গেলেন, শিক্ষিত যশস্বী ছেলে পৈত্রিক সম্পত্তি মায় ভিটে শুদ্ধ নিজ নামে লিখে নিল, তারপর পিতাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। পিতা জেলে এলেন। ছেলে খোঁজ নেয় না,—না চিঠি লিখে, না দেখা ক'রে, না টাকা পাঠিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে দাদু খাতায় চ'লে যান।

দাদু চ'লে গেছেন। যাবার সময়ে একটি ধুতি গেরুয়া রংএ রাঙিয়ে প'রে গেছেন। দু-তিনটে চিঠি লিখেছেন, কেবল কবিতা। ঠিকানা দেননি। বহুদিন পরে আবার চিঠি পেলাম, দুটী লাইন সাংসারিক কথা আছে। "বড় শ্রীমান……কে লিখেছিলুম যে তোমার বাসায় পুত্রবধূ সেবা করবে—বিশেষ ব্যাধিতে ভুগছি—তা অস্বীকার করলে। মাসোহারা দিবে বলেছিল তা দেয় না—বিপন্ন হয়ে জামাইর আশ্রয়ে রয়েছি……বড় নন্দনের ব্যবহারে, এসে সে দেখাটা করলে না।"

দাদুর চিঠি পড়তে পড়তে প্রকাণ্ড ভারিক্কি ও মূল্যবান নরপুংগব হয়ে গেছি যেন। বসেছি আদালতের কাজি—গম্ভীর ভারভার্তিক মুখ, একদিকে পানাকুড় চরের জাহেদ আলি আর কলকাতার প্রফেসর মন্মথ সরকার, অন্যদিকে তাদের দুই বাবা, সামনে উদ্‌গ্রীব শ্রোতার দল আমার মহামূল্য রায়ের অপেক্ষায় হাঁ ক'রে চেয়ে আছে। আশ্চর্য মনের স্পর্ধা, যা দেখবে তাই বিচার করতে বসবে। যদি করতেই হয় যাও পানাকুড়ের চরে, যেখানে চাষীর সংসার নীড় বেঁধেছে ঝড় ও নদীর বুকে, আর পাবনার জমিদারীর ভিত যেখানে কালের আবর্তনে ধ্বসে পড়ছে,—দেখ গে দুই পিতৃপুরুষের কুষ্ঠি-ঠিকুজি,—তাদের সমাজ, গোষ্ঠী, শ্রেণীপরিবেশ, তবে পাবে ন্যায়-অন্যায়ের যথার্থ মাপকাঠি। তার চেয়ে থাক ও। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে কি কাজ? জাফর আলি আর কমল সরকারই যথেষ্ট। মরুক গে জাফরের বাপ আর কমলের ছেলে,—পানাকুড় আর পাবনা।

আশ্‌মান ও জমিন

আমাদের উপনিষদ বলেছিল—অনন্ত বিশ্ব লুকিয়ে আছে কনিষ্ঠ পরমাণুর মধ্যে। আজকের বিজ্ঞানও একথাই বলে। একটীর মধ্যে গ্রহ-নক্ষত্র-ছায়াপথ-ক্রমান্বয় আর একটীর মধ্যে ইলেক্‌ট্রন-প্রটন-তেজ-তরংগ। দুটীই সমান অজ্ঞেয়, সমান অনন্ত। ক্ষীয়মান বস্তু বিলীন হয়ে গেলে নিরালম্ব বিশ্ব হবে অসীম, এই হোল ডি-সিটারের কথা। ক্ষীয়মাণ বস্তু বিলীন হলে নিরালম্ব বিশ্ব হবে বিন্দু, এই হোল আইন্‌ষ্টাইনের কথা। একই তত্ত্ব, কারণ অসীম ও বিন্দুতে ভেদ নেই। যাদের মাপ নেই তাদের ভেদ কোথায়?

তবে এই যে বিজ্ঞানের প্রগতি অনন্ত বিশ্বের পরিধি বেষ্টন করতে ছুটেছে, পৃথিবীটাকে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোর মধ্যে, এতেই আমরা বেশী জানছি, বেশী পাচ্ছি,—না গভীর মননা, নিবিড় অনুভূতি নিয়ে ছোট্টটো গণ্ডির মধ্যে থেকে ক্ষুদ্রের ভেতর দিয়ে অনন্তকে জানা তাতেই বেশী জানা ও পাওয়া যায়? প্রগতি কি বহির্গামী না অন্তর্গামী,—বিস্তরমান পরিধির দিকে না সংকোচমান কেন্দ্রের দিকে? কেন্দ্রাভিগ গতি নিয়ে যে বিশ্বের অন্তরে ছুটেছে, বিন্দুর গভীরে যে ডুব দিয়েছে,—তার গতি কি প্রগতি নয়? বরং তার

একটা উপরি সুবিধা আছে, বাইরের বন্ধন তাকে রুখতে পারে না।

দিনকয়েক হোল গণ্ডি ছোট হতে হতে ঠেকেছে একটি সেল ও একটী মানুষে। মন হয়েছে অন্তরমুখী। সে মানবে না যে সে পিছিয়ে প'ড়ে আছে মানব-প্রগতির শোভাযাত্রা থেকে। বলছে—আমার ডেরা এই ৫×৭ হাত সেলটাই বিশ্ব, আর ঐ পাঁচিল পাহারা সাবু কারিগরই মানবলোক। অর্থাৎ দাঁড়াবার স্থান পেলেই অনন্ত কালাকাশ ক্রমান্বয়কে দেখা যায়, একটি মানুষ পেলেই মানবমনের খোলা আকাশে পাড়ি দেওয়া যায়। তবে ভালো ঘুড়ি চাই। মন উড়বে পাখা মেলে, সুতোর টানে নড়বে—বেয়াড়ার মতো গোত্তা খাবে না।

আইনষ্টাইন নয়, যোগসাধানাও নয়—শিখলাম সাবু কারিগরের কাছে। গণ্ডি যতো ছোট হয়ে চলেছে ততো মসলদার, জাফর শেষে সাবু এক একটী নতুন জিনিষ দেখিয়েছে। এই রকম দুটী-একটী ছিদ্র দিয়ে পূবের আলো এসে পড়েছে আমার পাঁচিল-ঘেরা উঠানে, চোখে অন্ধকারের পর্দা নামতে দেয়নি।

সাবুর কখনো পাঁচিলের দিকে মন থাকে না। বাইরে ও ছিল চৌকিদার—কিন্তু লাঠি-উর্দি ফেলে গোসাই-ফকিরদের পিছু পিছু ঘুরতো। ফলে যা হয়,—কোন একটা হাংগামায় কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে পড়ল। এখানে এসে সারাদিন দরবেশী গান গায়—গানের ছবিটি মুখে চোখে ভেসে ওঠে। শুনে ও দেখে সিপাই-জমাদারদেরও রিপোর্ট করতে মন যায় না।

পাঁচিলের মনে পাঁচিল প'ড়ে থাকে—পাহারা আর ফালতু, গায়ক আর শ্রোতা, কারো খেয়াল থাকে না সেদিকে। শুধু জেলের দেয়াল নয়, অনেক দেয়াল পার ক'রে নিয়ে যায় তার গান। বিশ্ব বিন্দুর মাঝে অনন্ত হয়ে যায়।

মানুষ জমির চাষ হইল না।
আজগুবি এক হ্যাচ্‌কা বানে
ডুইবা গ্যাল ঘোর তুফানে
....
সারাদিনের কামাই সার ভাবি তাই
আবাদ কইরা দিন ফুরাইল,
আমার হাল বইতে কাল গেল।
... ...
চৌগুনার লগ্ন গুইনা
সে দিন ত' আমি মানি না
বইসা থাকি না ফেলাই বিছন বুইনা।
মানুষ জমির চাষ হইল না।
মংগলবার আর অমাবশ্যা
সেদিনও থাকিনা বইসা
পাইলাম না তাহার দিশা
জোয়ালের দাগ কাঁধে রইল।
আমার হাল বইতে কাল গেল।

'হাল বইতে কাল গেল', 'জোয়ালের দাগ কাঁধে রইল', কিন্তু 'মানুষ জমির চাষ হইল না'।

বাংলার নিরক্ষর লোককবির বিদায়-সংগীত। যতো হাল টানি ততো তুফান নামে বান ডাকে সব ছারখার ক'রে দেয়। তবু চাষীকে এই জমি ও আবাদ নিয়েই থাকতে হবে।

অন্তরের মধ্যে সাড়া দিচ্ছে এই ব্যর্থ আক্ষেপের প্রতিধ্বনি। আমার সামুদ্রিক জীবনের সংগে কেমন ক'রে ঘটল সাবুর সহজ কবিদের মিতালি? তারা বেদ-উপনিষদ পড়েনি, প্লেটো-এরিষ্টটল

কাণ্ট-হেগেল পড়েনি—কোথায় পেল এ তত্ব? এই কূপমণ্ডুক গেঁয়ো বৈরাগীরা হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিখিল মানবতাকে দেখেছে। সহজতত্ত্ব, মহামানবতত্ত্ব, কিন্তু সহজ জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, আশ-পাশের লোকজনকে এমন কি নিজেকেও পাশ কাটিয়ে নয়। মনে হোল বাংলার নিজস্ব কাল্‌চারটী খুঁজে পেলাম,—বুদ্ধিবিলাসীর কাল্‌চার নয়, সে আছে বাংলার নব্যন্যায়ে,—বাংলার গণ-সংস্কৃতি। বিভেদকে সমন্বয় ক'রে নয়, বিভেদকে ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে এই গণ-সংস্কৃতির ধারা বয়ে গেছে, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধ তার সাবলীল গতিকে বাধা দেয়নি। বৌদ্ধ বৈষ্ণব তান্ত্রিক নাথ, শেষে উদ্ধত ইসলাম, সব সমধারে এই স্রোতের গতিতে গা মিলিয়ে দিয়েছে, সহজ মানুষ সবার ওপরে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে।—

> আলেফলতা, সহজ মানুষ আলেফলতা
> হায় কুঠুরির ভিত্‌রে মানুষ
> বাইরে মানুষ খুঁজলে মানুষ পাবে কোথা?
> সহজ মানুষ আলেফলতা।

বাইরে মানুষ খুঁজলে পাবে কোথায়? ফাইলের, ইয়ার্ডের লোকারণ্য ত' আবর্জনা যদি না কুঠুরির ভিতরের মানুষটির সন্ধান মেলে। বিশাল বিশ্ব ত' বাইরে নয়, সে আছে এই সেলে, আমার বন্ধনক্লিষ্ট দেহে অবলীলায়। যেতে হবে সেখানে ফিরে, সৌরভমত্ত রূপনগরে, সহজ আপনাতে, যেখানে বিশ্বচরাচর বন্যায় ভেসে যায়, যেখানে

> "রূপভাবনা গলায় সোনা ঘুচলে মনের ধান্ধা
> রূপের ধারা বাউলপারা বহিছে জগত আন্ধা।"

গেয়েছেন আকিঞ্চন দাস, বিবর্তবিলাসের কবি। সাবুর গানে আছে তার সুর—

রংমহলের পুঁজি খুলে দেখ রে পাগল মন।
শুদ্ধকান্ত রসিক হইলে দেখতে পাবি হারাধন।
যে জন ডাকার মত ডাকতে পারে
পলকে রূপ ঝলক মারে
বসত করে রূপনগরে তারে কর অন্বেষণ।

চারদিকে এতো রং-এর ছড়াছড়ি কিন্তু চোখ ছেয়ে আছে গভীর কালো যবনিকা। মাঝে মাঝে কেটে যায় ঘুমের ঘোর, তখন দৈনন্দিনের রুক্ষ চিরাচরণ ছাপিয়ে ঝলক মারে রংমহলের রূপ—চিত্রে ও বৈচিত্র্যে, এই ছাঁচে-ঢালা শুক্‌নো কারাগার হয়ে ওঠে রসভারে সমৃদ্ধ, তার মহলে মহলে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা।

সাবু যেবার প্রথম রূপনগরের পথে পা বাড়িয়েছিল তখন রাজসাহীর নিয়ামৎপুর থানায় চৌকিদার বাহিনীর হাজিরা ও গুনতি চলছে। উর্দিপরা চামড়ার পেটি লাগানো লাঠি ঘাড়ে ৬০।৭০ জন শান্তিরক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। সাবুর দেখা নেই। গত রাত্রে তার এলাকা কাঁঠালবাড়ি ডাকাতি হয়েছে। ভোলা চৌকিদার বল্‌লে সাবু রোঁদে বেরোয় নি। দারোগাবাবু তদন্তে যাবেন। শেষবারের মতো হুংকার দিলেন, সাড়া নেই। বেচারার দুর্ভাগ্য আঁচ ক'রে সবাই তটস্থ।

সাবু কি তখন এ রাজ্যে আছে? কোথায় নিয়ামৎপুর আর কোথায় রূপনগর! কোথায় দারোগাবাবু আর কোথায় গগনসাঁইর আখ্‌ড়া! চৌকিদার তখন গাইছে—

যে জন পদ্মহীন সরোবরে যায়
অতুল্য অমূল্য নিধি সামান্য সে নয়
অপূর্ব সে নদীর পানি
জন্মে তাতে মুক্তামনি

কি বলবো তার গুণ বাখানি
সামান্য সে নয়।

গগন সাবুর হাতে গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বলছে,—উপনগরের আমেজ পাইছ নি কারিগর? না পদ্মের মোহে আছ অথনো?

গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সাবু বলছে,—চোর বদমাস লইয়া জীবনটা কাটুল সাইঠাকুর,—বুঝি না কারে কও উপনগর কারে কও পদ্ম। কেবল বুঝি পরাণটা আথার-পাথার করে।

গগন হেঁয়ালি ক'রে বলে—ঠিক বলছ, ঐটাই উপনগরের টান। লালন নিরঞ্জন-পন্থী তাই বলছে পদ্মহীন সরোবর। কামাল সাই মোছলমান, সে উপনগরকে বলছে মক্‌কা—

মক্‌কার ঘর সিংদুয়ারি
ঝরকা-কাটা মট্‌কা-আটা
উল্‌টা পাকে ঘুরছে চাবি।

এই প্রশ্নটার অপরাধেই সাবু জেলে এসেছে,—কোথায় সে মুরশিদ যে সিংহদ্বারের চাবি ঘুরিয়ে দেবে উল্‌টা পাকে, মুক্তি দেবে মানুষকে তার সহজ সত্তায়?

সে এক নারী। সিংদুয়ারের সামনে চাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তন্বী,—রাজকুমারী লক্ষ্মীংকরা। কে সে কন্যা, কেন সে ঐশ্বর্যলালিতা নেমে এল তার স্বর্ণপালংক থেকে তা কেউ জানে না। নেমে এল সে সহজ পথে—পেছনে ফেলে রাজপ্রাসাদ। ডাক দিল মানুষকে। তারা বেরিয়ে এল খেলার পুতুল দেবমূর্তি ফেলে।

শূন্য প্রাসাদের পাশে প'ড়ে রইল শূন্য মন্দির। দেবতার অধিষ্ঠান হোল দেহ-দেউলে।

আউলিয়া ব্রজদাস এমনি একজন বেরিয়ে-আসা সহজপন্থী। ছিল চোর, দু'বার জেল ঘুরে এসে চাঁড়াল বামুন একটা ডালা আর গোপীযন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। মোমিনপুরে বাঁশপোতার জংগলের ধারে তার বাউল-থানা। যতো অবধুতের দল এসে জোটে সেখানে। গান হয়,—শোনে চোর, চাঁড়াল আর শেয়াল। দেহতত্ত্ব বুঝতে এসে দু'রাত্রি সাবু ঘর ছেড়ে সেখানে পড়েছিল। ব্রজদাসের গীত একবার শুনলে মনে গেঁথে থাকে ;—

শিরে বসি মনিগংগা কর্ণেতে চেতন,
আঁখির কোটে বসি দীননাথ ধর্ম নিরঞ্জন।
নাসিকা দেবের বাঁশী ব্রহ্মা ব'সে মুখে,
হাড়েতে হাড়িপা ব'সে বিষ্ণু ব'সে কোঁখে,
নাভিতে মীননাথ ব'সে গোরক্ষ ব'সে বুকে,
ইন্দ্রঘাটে শিবের আসন আছে যোগমুখে।

দেহের সর্বাংগে দেবতার আসন পাতা। শুধু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নয়, বৌদ্ধের অমূর্ত দেবতা নিরঞ্জন আর নাথসিদ্ধা হাড়িপা, মৎস্যেন্দ্রনাথ আর গোরক্ষনাথ সমবেতভাবে দেহকে ধারণ ক'রে আছে। কিন্তু মনে একটা খট্‌কা উঠেছিল,— আল্লায় বসল কই, অস্থল নাই এই দেহে? ব্রজদাস ঠিক আঁচ ক'রে নেয়, ঠাট্টা ক'রে বলে—আল্লায় হিঁদুর দেবতার লগে কাইজা করে,—কিন্তু দেহ ছাড়ে নাই। তোদের শাস্তরেও আছে—

মনরে, ফকির হইতে চাও তুই দরবেশ হইতে চাও
আপন দেহের খবর করলি না।
লাহু দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা

পাথর ভাসিয়া চলে আর ডুইবা চলে সোলা।
মুখ মক্কা নাক নবি পেট পয়গম্বর
হাত হজরত পাও ফেরেশ্‌তা কপাল বারামখানা।
আপন দেহের খবর করলি না।

নিরঞ্জনীদের দোহায়ও গাইছে—

এথ্‌থু সে সুরসুরি জমুনা
এথ্‌থু সে গংগা সাঅরু
এথ্‌থু পআগ বনারসি
এথ্‌থু সে চন্দ দিবাঅরু।

ব্রজদাস বুঝিয়ে দিল বোষ্টমদের পদাবলী থেকে—ভজনের মূল এই নরবপু দেহ। নায়িকা সাধনের আগে দেহকে সাধনের উপযোগী ক'রে গড়তে হবে। তারপরে ধরল তন্ত্রসাধনার গুপ্তপ্রণালী যাতে যোগসিদ্ধি হয়। অনেক কথা সাবু বুঝতে পারে নি। জংঘাদেশে প্রেম-সরোবর মানে কি, কুলকুণ্ডলিনী কাকে বলে, কেমন ক'রে তাকে জাগ্রত ক'রে মস্তিষ্কের সহস্রার পদ্মে প্রেরণ করতে হয়। সে আরম্ভ করেছিল পদ্মাসনে ব'সে নাসাগ্রে মনস্থির ক'রে শ্বাসবায়ুর সংযম ও নিয়ন্ত্রণ। ওদিকে মাধু ডোম্‌নীর হাতে তারের টুংটাং ব্রজদাসের গলায় বাউলের গুনগুন—

সরোবরে ফুটেছে এক ফুল
ও তা জানে আল্লা মালিকুল।
ফুল ফুটেছে নিকাশ নদীর কুল *
সরোবরে শতদলে হৃদ্‌কমলে ফুটেছে এই ফুল।
ফুলেতে বিজলি খেলে সেই ত' ফুলের নাম রসুল।

---

* নিঃশ্বাস

তাইত'! ক্রমে সব অন্ধকার হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে আন্ধার কাটিয়ে জ্বলে উঠছে নূরের রোশনাই,—যে নূর ঘিরে আছে নিরঞ্জনকে, যে নূরে জন্ম হয় নবির। সাবু শিরদাঁড়া আরো টেনে তোলে, মনকে নিবিষ্ট করে।—

মক্কার ঘরের উত্তর দিকে বায়তুল মোকাদ্দাস *।
সেই ঘরে বিরাজ করে মহম্মদ রসুল।
আপনার অংগ দেখ
নিজ অংগ-ধ্যান কইরা নয়ন ভইরা দেখ।
শিরকলাতে ফুটছে ফুল
তার বাইরে আগা ভিতরে মূল
তাহা চিন মুরশিদ ভজিয়া।
লা-ইলাহা + পাল্লা দিয়া
ইল্লা আল্লার + দাঁড়ি দিয়া
মুরশিদ পদে ভক্তি দিয়া
শিখ দোকানদারি।
সেই পাল্লাতে ওজন হইলে হইবে ব্যাপারী।

এমন সময়ে ঘরে যেন বাজ পড়ল। সাবুর বিবি মুন্নী ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল, তার তিন বছরের মেয়েটাকে ধপাস্ ক'রে ফেলে দিলে পদ্মাসন সাবুর সামনে, মাধু ডোম্নীকে কয়েকটা অশ্রাব্য সম্ভাষণ বর্ষণ ক'রে ছুঁড়ে ফেললে গোপীযন্ত্র, তারপর চোর দারোগা ব্রজদাস গাঁয়ের লোক এবং পোড়া অদৃষ্টের বাপান্ত আর শাপান্ত ক'রে নিজের সর্বদেব-অধ্যুষিত বরতনুখানি মেঝের ওপর লম্বা ক'রে লুটিয়ে মরা কান্না জুড়ে দিল।

---

* প্যালেষ্টাইন + লা-ইলাহা-ইল্লা-আল্লা—আল্লা ব্যতীত উপাস্য নাই।

কুলকুণ্ডলিনীর যোগনিদ্রা আর ভাংলো না। দারুণ লজ্জা ও ভয় নিয়ে সাবু মাথা তুলে আউল-বাবার দিকে তাকাল। মুখে হাসি দেখে মুছে গেল সরম-সংকোচ। ব্রজদাস ধীরস্বরে বল্লে—"বিবিরে ঘরে নিয়ে যা।"

এমন কতবার কতরকমে সাবুর যোগসিদ্ধিতে ব্যাঘাত হয়েছে। আউল-বাবা থানা গুটিয়ে চ'লে গেছে ভিন্ দেশে, দেখা হয়নি আর। মনে একটা কাঁটা বিঁধে আছে যেন। একটা কথা তাকে জিগেস করা হোল না।

এই সওয়ালের ধাক্কায় শেষে সাবু একরকম ফেরার হোল। বিশ মাইল হেঁটে সরার পীড়ের দরগায় জামাল ফকিরের সামনে হাজির করল সমস্যাটা,—এই যে দেহ, রূপ-রাগ-রতি-রসের উৎস ও আধার, পরম প্রেমকে আস্বাদন করবার একমাত্র অবলম্বন, সে কেন এমন ক্ষণভংগুর? রসরাজ যদি "কামরূপে প্রেম" আর "কায়ারূপে ছায়া" তবে কেন দেহ কামদগ্ধ, কেন কায়া অনিত্য?

জামাল ফকির জবাব দেয় না, কেবল হাসে আর গায়—

আজব সহর সহর লহর বানাইল কোন জন
এক জায়গাতে রাইখা থুইছে জল আর আগুন।
একজনা তার রথের চূড়া দুইজনা তার সারথি
তিনজনা সহায় হয়ে লণ্ঠনে জ্বালায় বাতি।
নও দরজা খোলা ঘর রত্নবেদী তার উপর
তার উপরে বিরাজ করে চিনতে নারে কোন জন।

নও দরজা খোলা তালা সেই তালা কেউ ভাবে না
কোন দিনকা চোর সাঁধায়ে সেই ঘরে দিবে হানা।
কেউ না থাকে সচেতন পায় না চোরের অন্বেষণ
এমন চোরা করবে চুরি সেই সহরের বস্তুধন।

এই দেহতরি নিয়ে পাড়ি দিবি দরিয়ার পানি? না আছে বাইন্ না আছে ছিরি। ন' ন'টা ছেঁদা দিয়া আক্‌ছার জল উঠ্‌ছে তরির ভিতর। দেহের রোমে রোমে ঢুকছে মাটি, কোষে কোষে সাঁধায় জরা ও মরণ। কিন্তু মন মানে কই? একটুখানি ঘর কয়দিনের মিয়াদ,—সে কেন মানবে এই সময়ের আর জায়গার গণ্ডী? সে সব ছাড়িয়ে ছুটবে। তার যে আকাংখার শেষ নাই,—তারে সামাল দিবি কেম্‌নে?

ফকির সাহেবের এলোমেলো কথা, সব বোঝা যায় না। এটুকু বোঝা গেল যে জীর্ণ দেহতরি নিয়ে ভবসমুদ্র পার হবার একমাত্র ভরসা কামিল পিছনদার—

ভবগুরু পারের কাণ্ডারি।
গুরু কৃপা করতে পারে হয় যদি মন জীর্ণ তরি।
জ্ঞানলগিতে দিয়া ঠেলা
কাম আদি ছয় দাঁড় কি ফেলা
অনুরাগ পালেতে চালা
ওরে আমার মন ব্যাপারী।

নয় দুয়ার দিয়ে বিষয়বাসনা দেহে প্রবেশ ক'রে চিত্তকে অস্থির করে। তা ব'লে দুয়ার রুদ্ধ কোরো না,—সুধু খেয়াল রাখো বিষয়-বাসনা ঝড়তুফানের মতো এসে সব ওলট্‌পালট্ ক'রে না দেয়—জল উঠে তরি না ডুবে যায়। জ্ঞান, ষড়রিপু, অনুরাগ, এদের চালকশক্তির জোরেই দেহতরি দরিয়া পার হবে। বাধা নয় এরা, কাম আদি

প্রবৃত্তিকে বিনাশ ক'রে দেহমুক্তি হবে না। এ তত্ত্ব যতো সহজ সাধনা ততো সহজ নয়। তাই আসে গুরুর কথা। গুরু জানে কোন মন্ত্রে এই উদ্দাম শক্তিকে করায়ত্ত করা যায়, কোন যাদুবিদ্যায় কাম হয় প্রেম, লোহা হয় সোনা,—

আশ্ মানে তার আখড়াবাড়ি
সে বাড়ি কেউ ত' চিনল না
গুরু-গোসাইর আজব কারখানা।
পাতালে লোহা ছিল
গুরু কি সন্ধানে তুলে লইল
তাতে এক পুট মিশাইল
বানাইল উত্তম চাঁদ সোনা।
কোথাকার কামিল এসে বানাইল নানান্ গহনা।

কিন্তু আর নয়। ক্রেমে আঁটা ছক-কাটা চলতি দুনিয়ায় ব্যতিক্রমের স্থান নেই। নদীর স্রোতও সহজ খাতে বইতে পায় না, প্রকৃতিকেও শাসন মানতে হয়, মানুষের ত' কথাই নেই। সহজে ও সমাজে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। পীর পয়গম্বর তলিয়ে গেছে, সাবু সামান্য লোক। সমাজের পেষণ-রোলার একদিনের এক চক্করে দ'লে মুচ্ড়ে দিলে তার খেয়াল পাগলামি। নিয়ামৎপুরে হুলুস্থুল কাণ্ড। সাতদিন ধ'রে সাবুর খোঁজ নেই। তার এলাকা রতনগঞ্জের হাটে তুমুল দাংগা হয়ে গেছে—খুন জখম রক্তগংগা। এতদিন দারোগাবাবু সহ্য করেছেন, কিন্তু এ বাড়াবাড়ি সহ্যের অতিরিক্ত। সরকারের নোকর, রোঁদ হাজিরা ত' গেছেই, এবার সে ফেরার। ছোট দারোগা হাফিজসাহেব তার দলবল নিয়ে সাবুকে পীরের দরগা থেকে গ্রেপ্তার করলেন। চোখের পলকে ভেঙে গেল আশ্ মানের আখ্ড়া-বাড়ি। কড়া জমিন্—সেখানে ছোট দারোগা সাহেবের

পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার মুন্নী বিবি আর আম্-আল্-আমিন মসজিদের ইমাম মৌলবী ওয়াহেদুজ্জামান।

হ্যাঁ, সে তো শুধু আইনদ্রোহী নয়, সে গৃহত্যাগী ধর্মভ্রষ্ট। সে গুণাহ্গার মোনাফেক না-পাক।

কোন আক্ষেপ নেই তাতে! সন্ন্যাসী সাবু কুলিকাম্লার কাজ করে, পাঁচিল পাহারা দেয়, আর গান গায়—তার পাঁচমেশালী, চালচুলোছাড়া, জাতগোত্রহীন গান,—আউল বাউল সাই দরবেশী মুরশিদী কর্তাভজার জগাখিচুড়ি। বল্লাম—"একটা খাঁটি ইস্লামী গান শোনাও।" সাবু জবাব দিল—"খাঁটি ইস্লামী কারে কয় বাবু, সবই তো এক। নিরঞ্জন হচ্ছে আল্লা, আর সাধু-ফকিররা সবাই নবি। তেনাগোর মধ্যে হিঁদু-মোছলমানের ফারাক নাই বাবু।"

নবি চিন ওরে আমার মন
নবির ভেদ না জানলে পরে বৃথা রে জনম।
আউল আখের জাহের বাতুন
এই চাইর জায়গায় নবির আসন।
ওরে কোন ফাতেমার ঘরে রসুল
লইল আব্দুল্লার ঘরে জনম।
শিমুল ফুলে বইসা নবি শ্বেতবরণ এক পুষ্প হয়ে
ও তার মূল দেহটা কোথায় থুয়ে
লইল আব্দুল্লার ঘরে জনম।
নবি চিন ওরে আমার মন।

কি হবে নবি চিনে? এ নিয়ে কেন সাবুর মাথাব্যথা? এ কি ওর নিজস্ব একটা নেশা, না মানুষের ভালো করার উদ্দেশ্যশীল প্রেরণা? আসলে দুটো এক। নিজের পূর্ণপ্রাপ্তি না হলে অন্যকে দেবে কি? জোয়ালের দাগ কাঁধে থাকবে কিন্তু মানুষজমির চাষ হবে না। নিজেকে ভ'রে তুলতে পারলে তার বৈভব আপনি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। যোগসাধনা আর জনসেবা একই জিনিষের এপিঠ-ওপিঠ।

সাবুর কাঁধে জোয়ালের দাগ নেই, কপালে ভুরুর পাশে আছে একটা ক্ষতচিহ্ন। রাজ-আজ্ঞা ও শাস্ত্রবিধান লংঘন করার নির্মম সাক্ষ্য। "সাধন-ভজন ত' হয় নাই বাবু, বুকটা তাই কাঁইপা উঠ্‌ছিল। আল্লার দোয়া, সেইখনে মনে লইল সুফি পীরজাদার কথা। আওরাংজেবের খাড়া উঠ্‌ছে মাথার উপর, খাড়ারে ডাইকা বল্‌ছে—দয়াল, তুমি এই বেশে আইছ নি আমারে লইতে? আর স্মরণ রইল না কিছু।"

লাঠির স্বাক্ষর রাজতিলক হয়ে আছে কয়েদীর কপালে।

আমার ভাব দেখে সাবু লজ্জা পেয়ে যায়। কিছু নয়, কিছু নয় এক ঘা লাঠি আর পাঁচ বছর সাজা, নবিদের সাধনার কাছে এ কিছু নয়।—

সহজে কি ধন মিলে
পাগল, কামিল ভক্ত না হইলে?
আয়েব নবির আঠারো বছর
তাজা দেহ পোকায় খাইল
শোন তার খবর।
সে ত' মনরচনা কাঁচা সোনা
বিবির চুল ধইরা নামাজ পড়ে।
আয়েব নবির তিনজনা বিবির

দুইজনা ছাইড়া পলাইল
নবি না রাখে দাবী।
এক রহিমা খাতুন পইড়া রইল
নিজ মরণ স্বীকার ক'রে।
সহজে কি ধন মিলে
পাগল, কামিল ভক্ত না হইলে ?

রোগপংগু ভক্ত আয়েব উঠতে পারে না, কোন রকমে রহিমা বিবির চুল ধ'রে দাঁড়িয়ে নমাজ পড়ছে। সবাই ছেড়ে গেছে, রহিমা যায় নি। লোককবির মুখে আল্‌লার চেয়ে মানুষ বড় হয়ে উঠেছে তার সকরুণ স্নিগ্ধ গরিমায়। বাংলার জলো মাটিতে ভিজে গেছে আরব-মরুর ইস্‌লাম।

যে-কথা খুঁজে ফিরেছি, বলতে চেয়েছি কিন্তু ভাষা দিতে পারি নি,—জানতাম না সে-কথা এমন সুন্দর ক'রে বলা হয়ে গেছে।—যাদের জিনিষ তারাই বলেছে তাদের মতন ক'রে, আমাদের কেতাবি বিদ্যার ছকে ফেলে নয়। সমাজের নিম্নতন স্তর থেকে জনতার ব্যথা-মমতার নির্যাস ব'য়ে, সুফি কবি ও বৌদ্ধ দোঁহারের ওয়ারিশ নিয়ে এই সহজিয়া গ্রাম্য কবিরা উঠে এসেছেন উর্দ্ধতম ভাবলোকে,—রচনা করেছেন বাংলার গণদর্শন, বাংলার লোক-সংস্কৃতি। হেগেল-মার্ক্‌স্‌, শপেনহয়ের-নীট্‌শে বলেছেন—সবার উপরে বিরোধ সত্য। বাংলার আউল-বাউল জেনেছে—সবার উপরে মানুষ সত্য। হেগেল-মার্ক্‌স্‌-এর মতো সে বিরোধের সমন্বয় খোঁজে নি। সমন্বয় যদি হয় শুধুমাত্র

নতুন বিরোধের জন্মদাতা তা হ'লে কি লাভ আছে তাতে? সে দেখেছে বিরাগটা দৃশ্য, অনুরাগটাই বাস্তব। প্রাতিভাসিক বিরাগে প্রচ্ছন্ন এই অনুরাগই পরম প্রমা। নিখিল চরাচরে এ ওতপ্রোত। এই যে অনুপরমাণু হতে নক্ষত্রনীহারিকা পর্যন্ত সব পরস্পরকে আকর্ষণ করছে, এই দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তি জীবের বুকেও জেগে আছে। জড় ও জীব একই অনুরাগে পৃক্ত, প্রেমরসে উচ্ছল প্রকৃতি, মানুষ যাবে কোথায়? কিন্তু সভ্যতার বিকৃতি মানুষের প্রেমস্নিগ্ধ জীবনে এনে দিয়েছে কুটিল বিদ্বেষ, রক্তমাংসে প্রবাহিনী প্রেম-গংগাকে করেছে অস্পৃশ্য অশুচী। কাজেই সহজ মানুষে ফিরে যেতে হলে প্রয়োজন সাধনার। বাহ্য প্রেম, দৈহিক প্রেমকে অবলম্বন ক'রে এ সাধনার আরম্ভ। নায়িকাকে নিয়ে যে রূপ-রস-রাগ-রতির খেলা, সাধনবলে আত্যন্তিক অভিব্যক্তিতে তা' পরিণত হয় শুদ্ধ পরকীয়ায়, বিশ্বপ্লাবী অনুরাগে। তখন মানুষে প্রকৃতিতে ভেদ থাকে না—

অখিল ভরিয়া যার নিত্য প্রেম রাস
পরমা প্রকৃতি যেই প্রেমেতে উদাস
যার প্রেমে মত্ত হয়ে ভ্রমে গ্রহ তারা
সাগরে তরংগে ছুটে সে প্রেমের ধারা
অন্তরে বাহিরে প্রেম, প্রেম ঘরে ঘরে
ভোগে প্রেম যোগে প্রেম রোগে প্রেম ঝরে।

রসরত্নসারের কবি নরোত্তমের এই প্রেমই ব্রহ্মবিহার,—ইহাই সহজসিদ্ধি,—বাংলার লোকদর্শনের মর্মকথা।

নটেগাছটী

আমার কথাটী ফুরুল। কারণ নটেগাছটী না হলেও লোহার বড় গেটটা মুরিয়েছে। সিক্যুরিটি-পাড়া খালি হয়ে যাচ্ছে। বদ্‌লীর ডাক এল। এ বদ্‌লী নাকি মুক্তির মুখবন্ধ। ঝড়ের শেষে একটা শান্ত আলোর আশ্বাস ফুটে উঠছে দিগন্তের পারে।

'যাই', 'চল্‌লাম'। কথা আট্‌কে যায়। ওদের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। কিছুই পায় নি, তবু হতভাগাগুলো এমন ক'রে তাকায়! কেউ বলতে চায়, দেশ স্বাধীন হলে ওদেরও খালাস হবে কি না; কিম্বা বাবুরা চ'লে গেলে আবার সেই বেপর্দা মারপিট। হয়ত' বলতে চায় সুবিধে পেলে তার ঘর-সংসারের একটু খবর নিতে। মানুষের চাউনি এতো মর্মভেদী!

কী একটা অপরাধের বোঝা বুঝিবা বুকে চেপে বসেছে। যেন এদের ফেলে যাবো এমন ত' কথা ছিল না। যেন ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছি চোরের মতো। বাঁধ-দেওয়া সমুদ্রে বাঁধা পড়েছি, যেতে মন সরে না। কে বলে জেলে আনন্দ নেই, কে বলে বন্ধন নির্যাতন? ঠিক বলেছে মক্‌বুল,—জেলখানাতে দুঃখে আছেন কে বলে? একা আর সমুদ্র, স্বপ্ন আর বাস্তব, আশ্‌মান আর জমিন, সেল আর ফাইল। সব চ'লে যাক, আমি থাকবো এখানে।

হবে না। আর এক ঘণ্টা পরে এই সেল খালি প'ড়ে থাকবে। সেলে সেলে তালা পড়বে, খাঁ খাঁ করবে চারদিক। কয়েদীরা গা এলিয়ে দেবে। গাইবে তাদের গেঁয়ো গান রোজকার মতো, মাঝখানে তাল কেটে থেমে যাবে একটা শ্রোতার অভাবে। আমার সেলের ভেতর অন্ধকার ক্রমে ঘন হয়ে উঠবে। সেলটা কি আমাকে খুঁজবে না? ভাববে না কি,—এই যে ছিল খামখেয়ালী সৃষ্টিছাড়া লোকটা, সাবানের ফেনা নিয়ে খেলতো, আমাকে না হলে চলতো না ওর,—ও গেল কোথা? এমন সময়ে সেল তার দুয়ারে শুনতে পাবে কান্না,—নির্বোধ পশুর উচ্ছ্বসিত অবুঝ কান্না। মিনি সেলে সেলে খুঁজে ফিরবে তার হারাসাথীকে, না পেয়ে কাঁদবে। সেল সাড়া দেবে—আয় কাঁদিস নে, ও নেই।

আমি নেই। নিদারুণ ভয়ংকর সত্য—আমি নেই, মৃত্যুর চেয়ে অমোঘ। বাদসাহী জেলের ক্ষণিক আমি মহাকালে বুদ্‌বুদ হয়ে মিশে গেছি। আকাশের চতুর্থ সীমানায় একটা ঢেউ উঠেছিল—মান্নু সুনীল রসরাজ মসলদার মিনি জাফর সাবু আমি কাকের ডাক কয়েদীর গান নিমগাছ পাঁচিল—সব মিলে একটা ঢেউ, কোথায় গেল চিহ্ন রইল না। আমি বাইরে যাবো, ঝুলি নিয়ে কণ্ট্রোলের দোকানে কিউই ক'রে দাঁড়াবো, বক্তৃতা ক'রে দেশোদ্ধার করবো, কিম্বা গড়বো প্ল্যান আশ্রম দল যা হোক কিছু। বদ্ধ সাগরের ভাসমান জেলিমাছ থাকবে না।

কিন্তু কোথায় যাবে এ স্মৃতি, কোথায় যাবে এতো চোখের জল?—কোথায় যাবে এই কয়েদীদের দীর্ঘশ্বাস? কোথায় যাবে মিনির কান্না? কোথায় যাবে এই পুণ্যতীর্থে রেখে যাওয়া আমার ধ্যানের সঞ্চয়? চতুর্মুখী আকাশ-তরংগ যাবে মিলিয়ে, কিন্তু তার বাঞ্ছিত চূড়ায় সাতরঙা মায়া, তার ফেলে যাওয়া স্বপ্নের ছোঁওয়া, যা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-

কালের গণ্ডি ডিঙিয়ে আকাশের অজানা সীমানা বেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে ভেসে চ'লে গেল,—তার কিছুই থাকবে না কোথাও কারও জন্যে?—ফুরিয়ে যাবে নিঃশেষ হয়ে?.......

বাইরে শাস্ত্রিদের বিগল্ বেজে উঠ্‌ল,—দিনান্তের ঘোষণা।